শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুরাধা

১

কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়সের সম্বন্ধে যত মিথ্যা চালানো যায় চালাইয়াও সীমানা ডিঙাইয়াছে। বিবাহের আশাও শেষ হইয়াছে। —ওমা, সে কি কথা! হইতে আরম্ভ করিয়া চোখ টিপিয়া কন্যার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াও এখন আর কেহ রস পায় না, সমাজে এ রসিকতাও বাহুল্য হইয়াছে। এম্নি দশা অনুরাধার। অথচ ঘটনা সে-যুগের নয়, নিতান্তই আধুনিক কালের। এমন দিনেও যে কেবল মাত্র গণ-পণ, ঠিকুজি-কোষ্ঠী ও কুল-শীলের যাচাই বাছাই করিতে এমনটা ঘটিল—অনুরাধার বয়স তেইশ পার হইয়া গেল, বর জুটিল না—একথা সহজে বিশ্বাস হয় না। তবু ঘটনা সত্য। সকালে এই গল্পই চলিতেছিল আজ জমিদারের কাছারিতে। নূতন জমিদারের নাম হরিহর ঘোষাল, কলিকাতা বাসী—তাঁর ছোটছেলে বিজয় আসিয়াছে গ্রামে।

বিজয় মুখের চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললে গগন চাটুয্যের বোন্? বাড়ী ছাড়বে না?

যে লোকটা খবর আনিয়াছিল সে কহিল, বললে—যা বলবার ছোটবাবু এলে তাঁকেই বলবো।

বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার বলবার আছে কি! এর মানে

তাদের বার করে দিতে আমাকে যেতে হবে নিজে। লোক দিয়ে হবে না?

লোকটা চুপ করিয়া রহিল, বিজয় পুনশ্চ কহিল, বলবার তার কিছুই নেই বিনোদ, কিছুই আমি শুনবো না। তবু তাঁরি জন্যে আমাকেই যেতে হবে তাঁর কাছে—তিনি নিজে এসে দুঃখ জানাতে পারবেন না?

বিনোদ কহিল, আমি তাও বলেছিলাম। অনুরাধা বললে, আমিও ভদ্র-গেরস্ত-ঘরের মেয়ে বিনোদদা, বাড়ী ছেড়ে যদি বার হতেই হয় তাঁকে জানিয়ে একেবারেই বার হয়ে যাবো, বার বার বাইরে আসতে পারবো না।

কি নাম বললে হে, অনুরাধা? নামের ত দেখি ভারি চটক্—তাই বুঝি এখনো অহঙ্কার ঘুচ্‌লো না?

আজ্ঞে না।

বিনোদ গ্রামের লোক, অনুরাধাদের দুর্দ্দশার ইতিহাস সে-ই বলিতেছিল। কিন্তু অনতিপূর্ব্ব ইতিহাসেরও একটা অতিপূর্ব্ব ইতিহাস থাকে—সেইটা বলি।

এই গ্রামখানির নাম গণেশপুর, একদিন ইহা অনুরাধাদেরই ছিল, বছর-পাঁচেক হইল হাত-বদল হইয়াছে। সম্পত্তির মুনাফা হাজার-দুয়ের বেশি নয় কিন্তু অনুরাধার পিতা অমর চাটুয্যের চাল-চলন ছিল বিশ হাজারের মতো। অতএব ঋণের দায়ে ভদ্রাসন পর্য্যন্ত গেল ডিক্রি হইয়া। ডিক্রি হইল, কিন্তু জারি হইল না, মহাজন ভয়ে থামিয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন যেমন বড় কুলীন তেমনি ছিল প্রচণ্ড তাঁর জপ-তপ ক্রিয়াকর্ম্মের খ্যাতি।

তলা-ফুটা সংসার-তরণী অপব্যয়ের লোনা-জলে কানায়-কানায় পূর্ণ হইল কিন্তু ডুবিল না। হিন্দু-গোঁড়ামির পরিস্ফীত পালে সর্ব্ব-সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধার ঝোড়ো হাওয়া এই নিমজ্জিত নৌকাখানিকে ঠেলিতে ঠেলিতে দিল অমর চাটুয্যের আয়ুষ্কালের সীমানা উত্তীর্ণ করিয়া। অতএব চাটুয্যের জীবদ্দশাটা একপ্রকার ভালই কাটিল। তিনি মরিলেনও ঘটা করিয়া, শ্রাদ্ধশান্তিও নির্ব্বাহিত হইল ঘটা করিয়া, কিন্তু সম্পত্তির পরিসমাপ্তিও ঘটিল এইখানে। এতদিন নাকটুকু মাত্র ভাসাইয়া যে-তরণী কোনমতে নিশ্বাস টানিতেছিল এইবার 'বাবুদের-বাড়ী'র সমস্ত মর্য্যাদা লইয়া অতলে তলাইতে আর কাল-বিলম্ব করিল না।

পিতার মৃত্যুতে পুত্র গগন পাইল এক জরা-জীর্ণ ডিক্রি-করা পৈতৃক বাস্তভিটা, আকণ্ঠ ঋণ-ভার-গ্রস্ত গ্রাম্য সম্পত্তি, গোটা-কয়েক গরু-ছাগল-কুকুর বিড়াল এবং ঘাড়ে পড়িল পিতার দ্বিতীয় পক্ষের অনূঢ়া কন্যা অনুরাধা।

এইবার পাত্র জুটিল গ্রামেরই এক ভদ্র ব্যক্তি। গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে-মেয়ে ও নাতী-পুতী রাখিয়া বছর-দুই হইল তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, সে বিবাহ করিতে চায়।

অনুরাধা বলিল, দাদা, কপালে রাজপুত্র ত জুটলো না, তুমি এইখানেই আমায় ধরে দাও। লোকটার টাকাকড়ি আছে তবু দুটো খেতে-পরতে পাবো।

গগন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি কথা! ত্রিলোচন গাঙুলির পয়সা আছে মানি, কিন্তু ওর ঠাকুর্দ্দাদা কুল ভেঙে সতীপুরের চক্রবর্তীদের ঘরে বিয়ে করেছিল জানিস্? ওদের আছে কি?

বোন বলিল, আর কিছু না থাক টাকা আছে। কুল নিয়ে উপোস করার চেয়ে দুমুঠো ভাত-ডাল পাওয়া ভালো দাদা।

গগন মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হয় না—হবার নয়।

কেন নয় বলো ত? বাবা ও-সব মানতেন, কিন্তু তোমার ত কোন বালাই নেই।

এখানে বলা আবশ্যক পিতার গোঁড়ামি পুত্রের ছিল না। মদ্য-মাংস ও আরও একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত পুরুষ। পত্নী বিয়োগের পরে ভিন্ন-পল্লীর কে একটি নীচজাতীয় স্ত্রীলোক আজও তাহার অভাব মোচন করিতেছে একথা সকলেই জানে।

গগন ইঙ্গিতটা বুঝিল, গর্জ্জিয়া বলিল, আমার বাজে গোঁড়ামি নেই কিন্তু কন্যাগত কুলের শাস্ত্রাচার কি তোর জন্যে জলাঞ্জলি দিয়ে চোদ্দপুরুষ নরকে ডোবাবো? কৃষ্ণের সন্তান, স্বভাব কুলীন আমরা—যা যা, এমন নোঙরা কথা আর কখনো মুখে আনিস্ নে। বলিয়া সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল, ত্রিলোচন গাঙুলির প্রস্তাবটা এইখানেই চাপা পড়িল।

গগন হরিহর ঘোষালকে ধরিয়া পড়িল—কুলীন ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিতে হইবে। কলিকাতার কাঠের ব্যবসায়ে হরিহর লক্ষপতি ধনী। একদিন তাঁহার মাতুলালয় ছিল এই গ্রামে, বাল্যে বাবুদের বহু সুদিন তিনি চোখে দেখিয়াছেন, বহু-কাজ-কর্ম্মে পেট ভরিয়া লুচি-মণ্ডা আহার করিয়া গিয়াছেন, টাকাটা তাঁহার পক্ষে বেশি নয়, তিনি সম্মত হইলেন। চাটুয্যেদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া হরিহর গণেশপুর ক্রয় করিলেন, কুণ্ডুদের ডিক্রির

টাক দিয়া ভদ্রাসন ফিরাইয়া লইলেন, কেবল মৌখিক সর্ত্ত এই রহিল যে বাহিরের গোটা দুই-তিন ঘর কাছারির জন্য ছাড়িয়া দিয়া গগন অন্দরের দিকটায় যেমন বাস করিতেছে তেমনই করিবে।

তালুক খরিদ হইল কিন্তু প্রজারা মানিতে চাহিল না। সম্পত্তি ক্ষুদ্র, আদায় সামান্য, সুতরাং বড় রকমের কোন ব্যবস্থা করা চলে না, কিন্তু অল্পের মধ্যে কি কৌশল যে গগন খেলিতে লাগিল, হরিহরের পক্ষে কোন কর্ম্মচারী গিয়াই গণেশপুরে টিকিতে পারিল না, অবশেষে গগনের নিজেরই প্রস্তাবে সে নিজেই নিযুক্ত হইল কর্ম্মচারী, অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী সাজিলেন বর্ত্তমান জমিদারের গমস্তা। মহাল শাসনে আসিলে, হরিহর হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু আদায়ের দিক দিয়া রহিল যথাপূর্ব্ব স্তথা পরঃ। এক পয়সা তহবিলে জমা পড়িল না। এমনি ভাবে গোলমালে আরও বছর-দুই কাটিল, তার পরে হঠাৎ একদিন খবর আসিল গমস্তাবাবু গগন চাটুয্যেকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সদর হইতে হরিহরের লোক আসিয়া খোঁজ-খবর তত্ত্ব-তল্লাস করিয়া জানিল আদায় যাহা হইবার হইয়াছে, সমস্তই গগন আত্মসাৎ করিয়া সম্প্রতি গা-ঢাকা দিয়াছে। পুলিশে ডায়রি, আদালতে নালিশ, বাড়ী খানা-তল্লাসী প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সবই হইল, কিন্তু না টাকা, না গগন কাহারও সন্ধান মিলিল না। গগনের ভগিনী অনুরাধা ও দূর সম্পর্কের একটি ছেলেমানুষ ভাগিনেয় বাটীতে থাকিত, পুলিশের লোক তাহাদের বিধিমত কষামাজা ও নাড়াচাড়া দিল কিন্তু কোন তথ্যই বাহির হইল না।

বিজয় বিলাত-ফেরত। তাহার পুনঃ পুনঃ এগজামিন ফেল করার রসদ যোগাইতে হরিহরকে অনেক টাকা গণিতে হইয়াছে। পাশ করিতে সে পারে নাই, কিন্তু বিজ্ঞতার ফল স্বরূপ মেজাজ গরম করিয়া বছর-তুই পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়াছে। বিজয় বলে, বিলাতে পাশ-ফেলের কোন প্রভেদ নাই। বই মুখস্ত করিয়া পাশ করিতে গাধাতেও পারে, সে উদ্দেশ্য থাকিলে সে এখানে বসিয়াই বই মুখস্ত করিত, য়ুরোপ যাইত না। বাড়ী আসিয়া সে পিতার কাঠের ব্যবসায়ের কাল্পনিক তুরবস্থায় শঙ্কা প্রকাশ করিল এবং নড়-বড়, পড়ো-পড়ো কারবার ম্যানেজ করিতে আত্মনিয়োগ করিল। কর্ম্মচারী মহলে ইতিমধ্যেই নাম হইয়াছে—কেরাণীরা তাহাকে বাঘের মতো ভয় করে। কাজের চাপে যখন নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই এমনি সময়ে আসিয়া পৌছিল গণেশপুরের বিবরণ। সে কহিল, এ ত জানা কথা, বাবা যা করবেন তা এই রকম হতে বাধ্য। কিন্তু উপায় নাই, অবহেলা করিলে চলিবে না—তাহাকে সরেজমিনে নিজে গিয়া একটা বিহিত করিতেই হইবে। এই জন্যই তাহার গণেশপুরে আসা। কিন্তু এই ছোট কাজে বেশি দিন পল্লীগ্রামে থাকা চলে না, যত শীঘ্র সম্ভব একটা ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। সমস্তই যে একা তাহারি মাথায়। বড়ভাই অজয় এটর্ণি। অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজের আফিস ও স্ত্রী-পুত্র লইয়াই ব্যস্ত, সংসারের সকল বিষয়েই অন্ধ, শুধু ভাগা-ভাগির ব্যাপারে তাহার এক জোড়া চক্ষু দশ-জোড়ার কাজ করে। স্ত্রী প্রভাময়ী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, বাড়ীর

লোকজনের সম্বাদ লওয়া ত দূরের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া আছে কিনা খবর লইবারও সে বেশি অবকাশ পায় না। গোটা পাঁচ-ছয় ঘর লইয়া বাটীর যে-অংশে তাহার মহল সেখানে পরিজনবর্গের গতিবিধি সঙ্কুচিত, তাহার ঝি-চাকর আলাদা—উড়ে বেহারা আছে। শুধু বুড়া কর্ত্তার অত্যন্ত নিষেধ থাকায় আজও মুসলমান বাবুর্চ্চি নিযুক্ত হইতে পারে নাই। এই অভাবটা প্রভাকে পীড়া দেয়। আশা আছে শ্বশুর মরিলেই ইহার প্রতীকার হইবে। দেবর বিজয়ের প্রতি তাহার চিরদিনই অবজ্ঞা, শুধু বিলাত প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। দুই-চারি দিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে রাঁধিয়া ডিনার খাওয়াইয়াছে, সেখানে ছোট-বোন অনিতার সহিত বিজয়ের পরিচয় হইয়াছে। সে এবার বি-এ পরীক্ষায় অনার্সে পাশ করিয়া এম-এ পড়ার আয়োজন করিতেছে।

বিজয় বিপত্নীক। স্ত্রী মরার পরেই সে বিলাত যায়, সেখানে কি করিয়াছে না করিয়াছে খোঁজ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু ফিরিয়া পর্য্যন্ত অনেকদিন দেখা গিয়াছে স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তাহার মেজাজটা কিছু রুক্ষ, মা বিবাহের কথা বলায় সে জোর গলায় আপত্তি জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল, তখন হইতে অদ্যাবধি প্রসঙ্গটা গোলেমালেই কাটিয়াছে।

গণেশপুরে আসিয়া একজন প্রজার সদরে গোটা-দুই ঘর লইয়া বিজয় নূতন কাছারি ফাঁদিয়া বসিয়াছে। সেরেস্তার কাগজ-পত্র গগনের গৃহে যাহা পাওয়া গিয়াছে, জোর করিয়া এখানে আনা হইয়াছে এবং এখন চেষ্টা চলিতেছে তাহার ভগিনী অনুরাধা

ও দূর-সম্পর্কের সেই ভাগিনেয় ছোঁড়াটাকে বহিষ্কৃত করার। বিনোদ ঘোষের সহিত এইমাত্র সেই পরামর্শ-ই হইতেছিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় বিজয় তাহার সাত আট বছরের ছেলে কুমারকে সঙ্গে আনিয়াছে।

পল্লীগ্রামের সাপ-খোপ বিছা-ব্যাঙের ভয়ে মা আপত্তি করিলে বিজয় বলিয়াছিল, মা, তোমার বড়বৌয়ের প্রসাদে তোমার নাড়ু-গোপাল নাতী-নাতনীর অভাব নেই, কিন্তু এটাকে আর তা করো না। আপদ-বিপদে মানুষ হতে দাও।

শুনা যায়, বিলাতের সাহেবরাও নাকি ঠিক এমনিই বলিয়া থাকে। কিন্তু সাহেবদের কথা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে একটু গোপন ব্যাপার আছে। বিজয় যখন বিলাতে তখন মাতৃহীন ছেলেটার একটু অযত্নেই দিন গিয়াছে। তাহার ভগ্ন-স্বাস্থ্য। পিতামহী অধিকাংশ সময়েই থাকেন শয্যাগত, সুতরাং যথেষ্ট বিত্ত-বিভব থাকা সত্ত্বেও কুমারকে দেখিবার কেহ ছিল না, কাজেই দুঃখে-কষ্টেই সে বেচারা বড় হইয়াছে। বিলাত হইতে বাড়ী ফিরিয়া এই খবরটা বিজয়ের কানে গিয়াছিল।

গণেশপুরে আসিবার কালে বৌদিদি হঠাৎ দরদ দেখাইয়া বলিয়াছিল, ছেলেটা সঙ্গে যাচ্চে ঠাকুরপো, পাড়াগাঁ যায়গা একটু সাবধানে থেকো। কবে ফিরবে ?

যত শীঘ্র পারি।

শুনেচি আমাদের সেখানে একটা বড় বাড়ী আছে—বাবা কিনেছিলেন।

কিনেছিলেন, কিন্তু কেনা মানেই থাকা নয় বৌদি। বাড়ী আছে কিন্তু দখল নেই।

কিন্তু তুমি যখন নিজে যাচ্ছো ঠাকুরপো, তখন দখল আসতেও দেরি হবে না।

আশা ত তাই করি।

দখলে এলে কিন্তু একটা খবর দিও।

কেন বৌদি ?

ইহার উত্তরে প্রভা বলিয়াছিল, এই ত কাছে, পাড়া-গাঁ কখনো চোখে দেখি নি, একদিন দেখে আসবো। অনুরও কলেজ বন্ধ, সেও হয়ত সঙ্গে যেতে চাইবে।

এ প্রস্তাবে বিজয় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিয়াছিল, আমি দখল নিয়েই তোমাকে খবর পাঠাবো বৌদি, তখন কিন্তু না বলতে পাবে না। বোনটিকে সঙ্গে নেওয়া চাই।

অনিতা যুবতী, সে দেখিতে সুশ্রী ও অনার্সে বি-এ পাশ করিয়াছে। সাধারণ স্ত্রী জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ের বাহ্যিক অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রমণী বিশেষের একাধারে এতগুলা গুণ সে মনে মনে যে তুচ্ছ করে তাহা নয়। সেখানে শান্ত পল্লীর নির্জ্জন প্রান্তরে কখনো,—কখনো প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথের একান্তে সহসা মুখোমুখি আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে সেদিন বারবার করিয়া দোল দিয়া গিয়াছিল।

বিজয়ের পরণে খাঁটি সাহেবি পোষাক, মাথায় শোলার টুপি, মুখে কড়া চুরুট, পকেটে রিভলবার, চেরির ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাবুদের বাড়ীর সদর বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে মস্ত লাঠি হাতে দুজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান, অনেকগুলি অনুগত প্রজা, বিনোদ ঘোষ ও পুত্র কুমার। সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারে যদিও হাঙ্গামার ভয় আছে তথাপি ছেলেকে নাড়ু-গোপাল করার পরিবর্ত্তে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলার এ হইল বড় শিক্ষা—তাই ছেলেও আসিয়াছে সঙ্গে। বিনোদ বরাবর ভরসা দিয়াছে যে অনুরাধা একাকী স্ত্রীলোক কোন মতেই জোরে পারিবে না। তবু রিভলবার যখন আছে তখন সঙ্গে লওয়াই ভালো।

বিজয় বলিল, মেয়েটা শুনেছি ভারি বজ্জাত, লোক জড়ো ক'রে তুলতে পারে। ও-ই ত গগন চাটুয্যের পরামর্শদাতা। স্বভাব চরিত্রও মন্দ।

বিনোদ কহিল, আজ্ঞে, তা ত শুনি নি।

আমি শুনেচি।

কোথাও কেহ নাই, শূন্য প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বিজয় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবুদের বাড়ী বলা যায় বটে। সম্মুখে পূজার দালান এখনো ভাঙে নাই কিন্তু জীর্ণতার শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। এক পাশে সারি সারি বসিবার ঘর ও বৈঠকখানা—দশা একই। পায়রা, চড়াই ও চামচিকায় স্থায়ী আশ্রয় বানাইয়াছে।

দরওয়ান হাঁকিল, কোই হ্যায় ?

তাহার সম্ভ্রম-বিহীন চড়া-গলার চীৎকারে বিনোদ ঘোষ ও অন্যান্য অনেকেই যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; বিনোদ বলিল, রাধুদিদিকে আমি গিয়ে খবর দিয়ে আসচি বাবু। বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিতে বুঝা গেল, আজও এ-বাড়ীর অমর্য্যাদা করিতে তাহাদের বাধে।

অনুরাধা রাঁধিতেছিল, বিনোদ গিয়া সবিনয়ে জানাইল, দিদি, ছোটবাবু বাইরে এসেছেন।

সে এ দুর্দ্দৈব প্রত্যহই আশঙ্কা করিতেছিল, হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সন্তোষকে ডাকিয়া কহিল, বাইরে একটা সতরঞ্চি পেতে দিয়ে এসো বাবা, বলো গে মাসিমা আসচেন। বিনোদকে বলিল, আমার বেশি দেরি হবে না—বাবু রাগ করেন না যেন বিনোদদা, আমার হয়ে তাঁকে বসতে বলো গে।

বিনোদ লজ্জিত মুখে কহিল, কি করবো দিদি, আমরা গরীব প্রজা, জমিদার হুকুম করলে না বলতে পারি নে, কাজেই—

সে আমি বুঝি বিনোদদা।

বিনোদ চলিয়া গেল, বাহিরে সতরঞ্চি পাতা হইল কিন্তু কেহ তাহাতে বসিল না। বিজয় ছড়ি ঘুরাইয়া পায়চারি করিতে করিতে চুরুট টানিতে লাগিল।

মিনিট-পাঁচেক পরে সন্তোষ বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিতে দ্বারের প্রতি চাহিয়া সভয়ে কহিল, মাসিমা এসেছেন।

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। ভদ্র ঘরের কন্যা, তাহাকে কি

বলিয়া সম্বোধন করা উচিত সে দ্বিধায় পড়িল। কিন্তু দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইলে চলিবে না, অতএব পরুষ-কণ্ঠে অন্তরাল-বর্ত্তিনীর উদ্দেশে কহিল, এ বাড়ী আমাদের তুমি জানো?

উত্তর আসিল, জানি।

তবে ছেড়ে দিচ্চো না কেন?

অনুরাধা তেমনি আড়ালে দাঁড়াইয়া বোনপোর জবানি বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ছেলেটা চালাক চৌকোশ নয়, নূতন জমিদারের কড়া মেজাজের জনশ্রুতিও তাহার কানে পৌছিয়াছে, ভয়ে ভয়ে কেবলি থতমত খাইতে লাগিল একটা কথাও সুস্পষ্ট হইল না। বিজয় মিনিট পাঁচ-ছয় ধৈর্য্য ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপরে হঠাৎ একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার মাসির বলার কিছু থাক্‌লে সামনে এসে বলুক। নষ্ট করার সময় আমার নেই—আমি বাঘ-ভালুকও নয় তাকে খেয়ে ফেলবো না। বাড়ী ছাড়বে না কেন বলুক।

অনুরাধা বাহিরে আসিল না কিন্তু কথা কহিল। সন্তোষের মুখে নয় নিজের মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিল, বাড়ী ছাড়ার কথা ছিল না। আপনার বাবা হরিহরবাবু বলেছিলেন এর ভিতরের অংশে আমরা বাস করতে পারি।

কোন লেখা-পড়া আছে?

না নেই। কিন্তু তিনি এখনো জীবিত, তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবেন।

জিজ্ঞেসা করার গরজ আমার নেই। এই যদি সর্ত্ত তাঁর কাছে লিখে নাও নি কেন?

দাদা বোধহয় প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁর মুখের কথার চেয়ে লিখে নেওয়া বড় হবে এ হয়ত দাদার মনে হয় নি।

এ কথার সঙ্গত উত্তর বিজয় খুঁজিয়া পাইল না চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই জবাব আসিল ভিতর হইতেই।

অনুরাধা কহিল, কিন্তু দাদা নিজের সর্ত্ত ভঙ্গ করায় এখন সকল সর্ত্তই ভেঙে গেছে। এ বাড়ীতে থাকবার অধিকার আর আমাদের নেই। কিন্তু আমি একা স্ত্রীলোক আর এই অনাথ ছেলেটি। ওর মা-বাপ নেই, আমি মানুষ করচি, আমাদের এই দুর্দ্দশায় দয়া করে দুদিন থাকতে না দিলে একলা হঠাৎ কোথায় যাই এই আমার ভাবনা।

বিজয় বলিল, এ জবাব কি আমার দেবার? তোমার দাদা কোথায়?

মেয়েটি বলিল, আমি জানি নে তিনি কোথায়। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে এতদিন দেখা করতে পারি নি সে শুধু এই ভয়ে পাছে আপনি বিরক্ত হন। বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বোধকরি সে নিজেকে সামলাইয়া লইল; কহিল, আপনি মনিব আপনার কাছে কিছুই লুকোবো না। অকপটে আমাদের বিপদের কথা জানালুম, নইলে একটা দিনও জোর করে এ বাড়ীতে বাস করার দাবি আমি করি নে। এই কটা দিন বাদে আমরা আপনিই চলে যাবো।

তাহার কণ্ঠস্বরে বাহির হইতেও বুঝা গেল মেয়েটির চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। বিজয় দুঃখিত হইল, মনে মনে খুসিও হইল। সে ভাবিয়াছিল ইহাকে বে-দখল করিতে না জানি কত

সময় ও কত হাঙ্গামাই পোহাইতে হইবে, কিন্তু কিছুই হইল না, সে অশ্রুজলে শুধু দয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহার পকেটের পিস্তল এবং দরওয়ানদের লাঠি-সোটা তাহাকে গোপনে তিরস্কার করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করাও চলে না। বলিল, থাকতে দিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাড়ীতে আমার নিজের বড় দরকার। যেখানে আছি সেখানে খুব অসুবিধে, তা ছাড়া আমাদের বাড়ীর মেয়েরা একবার দেখতে আসতে চান।

মেয়ে বলিল, বেশ ত আসুন না। বাইরের ঘরগুলোতে আপনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, এবং ভিতরে দোতালায় অনেকগুলা ঘর। মেয়েরা অনায়াসে থাকতে পারবেন কোন কষ্ট হবে না। আর বিদেশে তাঁদের ত লোকের আবশ্যক, আমি অনেক কাজ করে দিতে পারবো।

এবার বিজয় সলজ্জ আপত্তি করিয়া কহিল, না না, সে কি কখনো হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে লোকজন সবাই আসবে তোমাকে কিছু করতে হবে না। কিন্তু ভিতরের ঘরগুলো কি আমি একবার দেখতে পারি ?

উত্তর হইল, কেন পারবেন না, এ ত আপনারই বাড়ী। আসুন।

ভিতরে ঢুকিয়া বিজয় পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখখানি দেখিতে পাইল। মাথায় কাপড় আছে কিন্তু ঘোমটায় ঢাকা নয়। পরণে একখানি আধময়লা আটপৌরে কাপড়, গায়ে গহনা নাই, শুধু, দুহাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি—সাবেক কালের। আড়াল হইতে তাহার অশ্রুসিঞ্চিত কণ্ঠস্বর বিজয়ের কানে বড়

মধুর ঠেকিয়াছিল, ভাবিয়াছিল মানুষটিও হয়ত এমনি হইবে। বিশেষতঃ, দরিদ্র হইলেও সে ত বড়ঘরের মেয়ে, কিন্তু দেখিতে পাইল তাহার প্রত্যাশার সঙ্গে কিছুই মিলিল না। রঙ ফর্সা নয় মাজা শ্যাম। বরঞ্চ একটু কালোর দিকেই! সাধারণ পল্লীগ্রামের মেয়ে আরও পাঁচজনকে যেমন দেখিতে তেমনি। শরীর কৃশ কিন্তু বেশ দৃঢ় বলিয়াই মনে হয়। শুইয়া বসিয়া ইহার আলস্যে দিন কাটে নাই তাহাতে সন্দেহ হয় না। শুধু বিশেষত্ব চোখে পড়িল ইহার ললাটে—একেবারে আশ্চর্য্য নিখুঁত গঠন।

মেয়েটি কহিল, বিনোদদা, বাবুকে তুমি সব দেখিয়ে আনো আমি রান্নাঘরে আছি।

তুমি সঙ্গে যাবে না রাধুদিদি?

না।

উপরে উঠিয়া বিজয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। ঘর অনেক-গুলি। সাবেক-কালের অনেক আসবাব এখনো ঘরে ঘরে, কতক ভাঙিয়াছে কতক ভাঙার পথে। এখন তাহাদের মূল্য সামান্যই কিন্তু একদিন ছিল। সদর-বাটির মতো ঘরগুলিও জরা-জীর্ণ, হাড়-পাঁজরা বার করা। দারিদ্র্যের দাগ সকল বস্তুতেই গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে।

বিজয় নীচে নামিয়া আসিলে অনুরাধা রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও ভদ্রঘরের মেয়ে, এবার তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে বিজয়ের লজ্জা পাইল, কহিল, আপনি কতদিন এ বাড়ীতে থাকতে চান?

ঠিক করে ত এক্ষুনি বলতে পারি নে, যে কটা দিন দয়া করে আপনি থাকতে দেন।

দিন-কয়েক পারি, কিন্তু বেশি দিন ত পারবো না। তখন কোথায় যাবেন ?

সেই চিন্তাই ত দিনরাত করি।

লোকে বলে, আপনি গগন চাটুয্যের ঠিকানা জানেন।

তারা আর কি বলে ?

বিজয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, অনুরাধা কহিল, জানি নে তা আপনাকে আগেই বলেচি, কিন্তু জানলেও নিজের ভাইকে ধরিয়ে দেবো এই কি আপনি আদেশ করেন ?

তাহার কণ্ঠস্বরে তিরস্কার মাখানো। বিজয় ভারি অপ্রতিভ হইল, বুঝিল আভিজাত্যের চিহ্ন ইহার মন হইতে এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। বলিল, না, সে কাজ আপনাকে আমি করতে বলি নে, পারি নিজেই খুঁজে বার করবো তাকে পালাতে দেবো না। কিন্তু এতকাল ধরে সে যে আমাদের এই সর্ব্বনাশ করছিলো এও কি আপনি জানতে পারেন নি বলতে চান ?

কোন উত্তর আসিল না। বিজয় বলিতে লাগিল, সংসারে কৃতজ্ঞতা বলে ত একটা কথা আছে। নিজের ভাইকে এই পরামর্শও কি কোনদিন দিতে পারেন নি ? আমার বাবা নিতান্ত নিরীহ মানুষ, আপনাদের বংশের প্রতি তাঁর অত্যন্ত মমতা, বিশ্বাসও ছিল তেমনি বড়, তাই গগনকে দিয়েছিলেন সমস্ত সঁপে, এ কি তারই প্রতিফল ? কিন্তু নিশ্চিত জানবেন আমি দেশে থাকলে কখনো এমন ঘটতে পারতো না।

অনুরাধা নীরব। কোন কথারই জবাব পাইল না দেখিয়া বিজয় মনে মনে আবার উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার যেটুকু করুণা জন্মিয়াছিল সমস্ত উবিয়া গেল, কঠিন হইয়া বলিল, সবাই জানে আমি কড়া লোক বাজে দয়া-মায়া করি নে, দোষ করে আমার হাতে কেউ রেহাই পায় না, দাদার সঙ্গে দেখা হলে এটুকু অন্ততঃ তাকে জানিয়ে দেবেন।

অনুরাধা তেমনি মৌন হইয়া রহিল। বিজয় কহিল, আজ সমস্ত বাড়ীটার আমি দখল নিলাম। বাইরের ঘরগুলো পরিষ্কার হ'লে দিন-দুই পরে এখানে চলে আসবো, মেয়েরা আসবেন তার পরে। আপনি নীচের একটা ঘরে থাকুন যে কদিন না যেতে পারেন, কিন্তু কোন জিনিস-পত্র সরাবার চেষ্টা করবেন না।

কুমার বলিল, বাবা, তেষ্টা পেয়েচে আমি জল খাবো।

এখানে জল পাবো কোথায় ?

অনুরাধা হাত নাড়িয়া ইসারায় তাহাকে কাছে ডাকিল, রান্নাঘরের ভিতরে আনিয়া কহিল, ডাব আছে খাবে বাবা ?

হাঁ খাবো।

সন্তোষ কাটিয়া দিতে ছেলেটা পেট ভরিয়া শাঁস ও জল খাইয়া বাহিরে আসিল , কহিল, বাবা তুমি খাবে ? খুব মিষ্টি।

না।

খাও না বাবা অনেক আছে। সব ত আমাদের।

কথাটা কিছুই নয়, তথাপি এতগুলি লোকের মধ্যে ছেলের মুখ হইতে কথাটা শুনিয়া হঠাৎ কেমন তাহার লজ্জা করিয়া উঠিল, কহিল, না না খাবো না তুই চলে আয়।

৩

বাবুদের বাড়ীর সদর অধিকার করিয়া বিজয় চাপিয়া বসিল। গোটা-দুই তাহার নিজের জন্য বাকিগুলা হইল কাছারি। বিনোদ ঘোষ কোন একসময়ে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করিয়াছিল সেই সুপারিশে নিযুক্ত হইল নূতন গমস্তা। কিন্তু ঝঞ্ঝাট মিটিল না। প্রধান কারণ, গগন চাটুয্যে টাকা আদায় করিয়া হাতে হাতে রসিদ লিখিয়া দেওয়া অপমানকর জ্ঞান করিত, যেহেতু তাহাতে অবিশ্বাসের গন্ধ আছে—সেটা চাটুয্যে বংশের অগৌরব। সুতরাং তাঁহার অন্তর্ধানের পরে প্রজারা বিপদে পড়িয়াছে, মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া নিত্যই হাজির হইতেছে, কাঁদা-কাটা করিতেছে—কে কত দিয়াছে কত বাকি রাখিয়াছে নিরূপণ করা একটা কষ্টসাধ্য জটিল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় যত শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবে মনে করিয়াছিল তাহা হইল না, একদিন-দুইদিন করিয়া দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল। এদিকে ছেলেটা হইয়াছে সন্তোষের বন্ধু, বয়সে তিন চার বছরের ছোট, সামাজিক ও সাংসারিক ব্যবধানও অত্যন্ত বৃহৎ, কিন্তু অন্য সঙ্গীর অভাবে সে মিশিয়া গেছে ইহারই সঙ্গে। ইহারই সঙ্গে থাকে বাটীর ভিতরে, ঘুরিয়া বেড়ায় বাগানে বাগানে নদীর ধারে—কাঁচা আম কুড়াইয়া পাখীর বাসা খুঁজিয়া। খায় অধিকাংশ সময়ে সন্তোষের মাসির কাছে, ডাকে তাহারি দেখাদেখি মাসিমা বলিয়া। বাহিরে টাকা-কড়ি হিসাব-পত্র লইয়া বিজয়

বিরক্ত, সকল সময়ে ছেলের খোঁজ করিতে পারে না, যখন পারে তখন তাহার দেখা মিলে না। হঠাৎ কোনদিন হয়ত বকাঝকা করে, রাগ করিয়া কাছে বসাইয়া রাখে কিন্তু ছাড়া পাইলেই ছেলেটা দৌড় মারে মাসিমার রান্নাঘরে। সন্তোষের পাশে বসিয়া খায় দুপুর-বেলা ভাত, বিকালে তাহারি সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া লয় রুটী ও নারিকেল নাড়ু।

সেদিন বিকালে লোকজন তখনো কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই, বিজয় চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া ভাবিল নদীর ধারটা খানিক ঘুরিয়া আসে। হঠাৎ মনে পড়িল সমস্ত দিন ছেলেটার দেখা নাই। পুরাতন চাকরটা দাঁড়াইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কুমার কোথায় রে?

সে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, বাড়ীর মধ্যে।

ভাত খেয়েছিল?

না।

জোর করে ধরে এনে খাওয়াস নে কেন?

এখানে খেতে চায় না, রাগ করে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

কাল থেকে আমার সঙ্গে ওর খাবার জায়গা করে দিস, বলিয়া কি ভাবিয়া আর সে বেড়াইতে গেল না সোজা ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত হইতে পুত্রের কণ্ঠস্বর কানে গেল—মাসিমা, আর একখানা রুটি আর দুটো নারকোল নাড়ু—শীগ্‌গির!

যাহাকে আদেশ করা হইল সে কহিল, নেবে আয় না বাবা, তোদের মতো আমি কি গাছে উঠতে পারি?

জবাব হইল—পারবে মাসিমা কিচ্ছু শক্ত নয়। ওই মোটা

ডালটায় পা দিয়ে এই ছোট ডালটা ধরে এক টান্ দিলেই উঠে পড়বে।

বিজয় কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের সম্মুখে একটা বড় আম গাছ, তাহার দুদিকের দুই মোটা ডালে বসিয়া কুমার ও বন্ধু সন্তোষ। পা ঝুলাইয়া গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়া উভয়ের ভোজন কার্য্য চলিতেছে, তাহাকে দেখিয়া দুজনেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনুরাধা রান্নাঘরের দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, ওই কি ওদের খাবার যায়গা নাকি?

কেহ উত্তর দিল না। বিজয় অন্তরাল-বর্ত্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনার ওপর দেখ্‌চি ও খুব অত্যাচার করচে। এবার অনুরাধা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, বলিল, হাঁ।

তবু ত প্রশ্রয় কম দিচ্চেন না—কেন দিচ্চেন?

না দিলে আরো বেশি উপদ্রব করবে সেই ভয়ে।

কিন্তু বাড়ীতে ত এ রকম উৎপাত করে না শুনেচি।

হয়ত করে না। ওর মা নেই, ঠাকুরমা প্রায়ই শয্যাগত, বাপ থাকেন বাইরে কাজকর্ম্ম নিয়ে, উৎপাত করবে কার ওপর?

বিজয় ইহা জানে না তাহা নয়, তথাপি ছেলেটার যে মা নাই এই কথাটা পরের মুখে শুনিয়া তাহার ক্লেশবোধ হইল, কহিল, আপনি দেখচি অনেক বিষয় জানেন, কে বললে আপনাকে? কুমার? অনুরাধা ধীরে ধীরে কহিল, বলবার বয়েস ওর হয় নি, তবু ওর মুখ থেকেই শুনতে পাই! দুপুর-বেলা রোদ্দুরে ওদের আমি বেরোতে দিই নে, তবু ফাঁকি দিয়ে পালায়। যেদিন পারে না আমার কাছে শুয়ে বাড়ীর গল্প করে।

বিজয় তাহার মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু সেই প্রথম দিনটির মতো আজো সেই কণ্ঠস্বর বড় মধুর লাগিল, তাই বলার জন্য নয় কেবল শোনার জন্যই কহিল, এবার বাড়ী ফিরে গিয়ে ওর মুস্কিল হবে!

কেন?

তার কারণ উপদ্রব জিনিসটা নেশার মতো। না পেলে কষ্ট হয়, শরীর আই-ঢাই করে। কিন্তু সেখানে ওর নেশার খোরাক যোগাবে কে? দুদিনেই ত পালাই পালাই করবে।

অনুরাধা আস্তে আস্তে বলিল, না ভুলে যাবে।—কুমার নেবে এসো বাবা, রুটি নিয়ে যাও।

কুমার বাটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিল এবং মাসির হাত হইতে আরও কয়েকটা রুটি ও নারিকেল নাড়ু লইয়া তাঁহারই গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আহার করিতে লাগিল, গাছে উঠিল না। বিজয় চাহিয়া দেখিল সেগুলি তাহাদের ধনী-গৃহের তুলনায় পদ-গৌরবে যেমনি হীন হোক সত্যকার মর্য্যাদায় কিছুমাত্র খাটো নয়। কেন যে ছেলেটা মাসির রান্নাঘরের প্রতি এত আসক্ত বিজয় তাহার কারণ বুঝিল। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল কুমারের লুব্ধতায় তাঁহার অহেতুক ও অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা তুলিয়া প্রচলিত শিষ্টবাক্যে পুত্রের জন্য সঙ্কোচ প্রকাশ করিবে এবং করিতেও যাইতেছিল কিন্তু বাধা পড়িল। কুমার বলিল, মাসিমা, কালকের মতো চন্দ্রপুলি করতে আজও যে তোমাকে বলেছিলুম করো নি কেন?

মাসিমা কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে বাবা, সাবধান হই নি। সমস্ত দুধ বেরালে উল্টে ফেলে দিয়েছে—কাল আর এমন হবে না।

কোন্ বেরালটা বলো ত ? শাদাটা ?

সেইটেই হবে বোধহয়, বলিয়া অনুরাধা হাত দিয়া তাহার মাথার এলো-মেলো চুলগুলি সোজা করিয়া দিতে লাগিল।

বিজয় কহিল, উৎপাত ত দেখচি ক্রমশঃ জুলুমে গিয়ে ঠেকেচে।

কুমার বলিল, খাবার জল কৈ ?

ঐ যাঃ—ভুলে গেছি বাবা, এনে দিচ্চি।

তুমি সবই ভুলে যাও মাসিমা। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না।

বিজয় বলিল, আপনার বকুনি খাওয়াই উচিত। ত্রুটি পদে পদে।

হাঁ, বলিয়া অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল। অসতর্কতা বশতঃ এ-হাসি বিজয়ের চোখে পড়িল। পুত্রের অবৈধ আচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করা আর হইল না, পাছে তাহার ভদ্রবাক্য অভদ্র ব্যঙ্গের মতো শুনায়, পাছে এই মেয়েটির মনে হয় তাহার দৈন্য ও দুর্দ্দশাকে সে কটাক্ষ করিতেছে।

পরদিন দুপুর-বেলা অনুরাধা কুমার ও সন্তোষকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তরকারি পরিবেশন করিতেছে, তাহার মাথার কাপড় খোলা, গায়ের বস্ত্র অসংবৃত, অকস্মাৎ দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িতে অনুরাধা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল ছোটবাবু। শশব্যস্তে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় বলিল, একটা অত্যন্ত জরুরি পরামর্শের জন্য আপনার কাছে এলুম। বিনোদ ঘোষ গ্রামের লোক, অনেকদিন দেখচেন, ও কি রকম লোক বলতে পারেন ? ওকে গণেশপুরের নতুন

গমস্তা বহাল করেচি, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় কি না—আপনার কি মনে হয় ?

বিনোদ এক সপ্তাহের অধিক কাজ করিতেছে, যথাসাধ্য ভালো কাজই করিতেছে কোন গোলযোগ ঘটায় নাই, সহসা হন্তদন্ত হইয়া তাহার চরিত্রের খোঁজ-তল্লাস করিবার এখনই কি প্রয়োজন হইল অনুরাধা ভাবিয়া পাইল না, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বিনোদদা কি কিছু করেছেন ?

এখনো কিছু করেনি কিন্তু সতর্ক হওয়া ত প্রয়োজন।

তাঁকে ভালো লোক বলেই ত জানি।

সত্যি জানেন, না নিন্দে করবেন না বলেই ভালো বল্‌চেন ?

আমার ভালো মন্দ বলার কি কিছু দাম আছে ?

আছে বই কি। সে যে আপনাকেই প্রামাণ্য-সাক্ষী মেনে বসেছে !

অনুরাধা একটু ভাবিয়া বলিল, উনি ভালো লোকই বটে। শুধু একটু চোখ রাখবেন। নিজের অবহেলায় ভালো লোকও মন্দ হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

বিজয় কহিল, সত্যিই তাই। কারণ অপরাধের হেতু খুঁজতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই অবাক হতে হয়।

ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোর ভাগ্য ভালো যে হঠাৎ এক মাসিমা পেয়ে গেছিস, নইলে এই বন-বাদাড়ের দেশে অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে কাটাতে হ'তো।

অনুরাধা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি এখানে খাবার কষ্ট হচ্চে ?

বিজয় হাসিয়া বলিল, না, এম্‌নিই বললুম। চিরকাল বিদেশে বিদেশে কাটিয়েছি খাবার কষ্ট বড় গ্রাহ্য করি নে। বলিয়া চলিয়া গেল। অনুরাধা জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল তাহার স্নান পর্য্যন্ত এখনো হয় নাই।

৪

এ বাড়ীতে আসিয়া একটা পুরাতন আরাম-কেদারা জোগাড় হইয়াছিল, বিকালের দিকে তাহারি দুই হাতলে পা জড়াইয়া দিয়া বিজয় চোখ বুজিয়া চুরুট টানিতেছিল, কানে গেল—বাবুমশাই ? চোখ মেলিয়া দেখিল অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে সসম্মানে সম্বোধন করিতেছে! বিজয় উঠিয়া বসিল। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের উপরে গিয়াছে কিন্তু দিব্য গোলগাল বেঁটে-খাটো শক্ত-সমর্থ দেহ। গোঁফ পাকিয়া শাদা হইয়াছে কিন্তু মাথার প্রশস্ত টাকের আশে-পাশের চুলগুলি ভ্রমর-কৃষ্ণ। সম্মুখের গোটা-কয়েক ছাড়া দাঁতগুলি প্রায় সমস্ত বিদ্যমান। গায়ে তসরের কোট, গরদের চাদর, পায়ে চীনা বাড়ীর বার্নিশকরা জুতা, ঘড়ির সোনার চেন হইতে সোনা বাঁধানো বাঘের নখ ঝুলিতেছে। পল্লী-অঞ্চলে ভদ্রলোকটিকে অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। পাশে একটা ভাঙা টুলের উপর বিজয়ের চুরুটের সাজ সরঞ্জাম থাকিত, সরাইয়া লইয়া তাঁহাকে বসিতে দিল। ভদ্রলোক বসিয়া বলিলেন, নমস্কার বাবু।

বিজয় কহিল, নমস্কার।

আগন্তুক বলিলেন, আপনারা গ্রামের জমিদার, মশায়ের পিতাঠাকুর হচ্ছেন কৃতী ব্যক্তি—লক্ষপতি। নাম করলে সুপ্রভাত হয়—আপনি তাঁরই সুসন্তান। স্ত্রীলোকটিকে দয়া না করলে সে যে ভেসে যায়।

কে স্ত্রীলোক? কত টাকা বাকি।

ভদ্রলোক বলিলেন, টাকার ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোকটি হচ্চে ঈশ্বর অমর চাটুয্যের কন্যা—প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—গগন চাটুয্যের বৈমাত্র ভগিনী। এ তার পৈতৃক গৃহ। সে থাকবে না চলে যাবে—তার ব্যবস্থাও হয়েছে—কিন্তু আপনি যে তারে ঘাড়ে ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছেন এ কি মশায়ের কর্ত্তব্য?

এই অশিক্ষিত বৃদ্ধের প্রতি ক্রোধ করা চলে না বিজয় মনে মনে বুঝিল, কিন্তু কথা বলার ধরণে জলিয়া গেল। কহিল, আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝবো কিন্তু আপনি কে যে তাঁর হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন?

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার নাম ত্রিলোচন গাঙ্গুলি, পাশের গ্রাম মসজিদপুরে বাড়ী—সবাই চেনে। আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে আমার কাছে গিয়ে হাত পাততে হয় না এমন লোক এদিকে কম। বিশ্বাস না হয় বিনোদ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করবেন।

বিজয় কহিল, আমার হাত পাতবার দরকার হলে মশায়ের খোঁজ নেবো, কিন্তু যাঁর ওকালতি করতে এসেছেন তাঁর আপনি কে জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক রসিকতার ছলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, কুটুম্ব। বোশেখের এই কটা দিন বাদে আমি ওঁকে বিবাহ করবো।

বিজয় চকিত হইয়া কহিল, আপনি বিবাহ করবেন অনুরাধাকে ?

আজ্ঞে হাঁ। আমার স্থির সঙ্কল্প! জ্যৈষ্ঠ ছাড়া আর দিন নেই নইলে এই মাসেই শুভকর্ম্ম সমাধা হয়ে যেতো, থাকতে দেবার কথা আপনাকে আমার বলতেও হ'তো না !

বিজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিল, বিয়ের ঘটকালী করলে কে ? গগন চাটুয্যে ?

বৃদ্ধ রোষ-কষায়িত চক্ষে কহিলেন, সে ত ফেরারী আসামী মশাই—প্রজাদের সর্ব্বনাশ করে চম্পট দিয়েছে। এতদিন সেই ত বাধা দিচ্ছিল নইলে অগ্রানেই বিবাহ হয়ে যেতো। বলে, স্বভাব কুলীন, আমরা কৃষ্ণের সন্তান—বংশজের ঘরে বোন দেব না। এই ছিল তার বুলি। এখন সে গুমোর রইলো কোথায় ? বংশজের ঘরে যেচে আসতে হ'লো যে! এখনকার দিনে কুল কে খোঁজে মশাই ? টাকাই কুল, টাকাই মান, টাকাই সব—বলুন ঠিক কি না ?

বিজয় বলিল, হাঁ ঠিক। অনুরাধা স্বীকার করেছেন ?

ভদ্রলোক সদম্ভে জানুতে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, স্বীকার ? বলচেন কি মশাই, যাচা-যাচি। সহর থেকে এসে আপনি একটা তাড়া লাগাতেই দুচোখে অন্ধকার—যাই মা তারা দাঁড়াই কোথা! নইলে আমার ত মৎলব ঘুরে গিয়েছিল। ছেলেদের অমত, বৌমাদের অমত, মেয়ে-জামাইরা সব বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—আমিও ভেবেছিলুম দূর হোক্ গে দু-সংসার ত হ'লো, আর না! কিন্তু লোক দিয়ে নিজে ডেকে পাঠিয়ে রাধা

কেঁদে বললে, গাঙ্গুলিমশাই, পায়ে স্থান দাও। তোমার ঘরে উঠোন ঝাঁট দিয়ে খাবো আমার সেও ভালো। কি করি স্বীকার করলুম।

বিজয় নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, বিবাহও এ-বাড়ীতেই হবে। দেখতে একটু খারাপ দেখাবে নইলে আমার বাড়ীতেই হতে পারতো। গগন চাটুয্যের কে এক পিসি আছে সে-ই কন্যা সম্প্রদান করবে। এখন কেবল মশাই রাজী হলেই হয়।

বিজয় মুখ তুলিয়া বলিল, রাজী হয়ে আমাকে কি করতে হবে বলুন? তাড়া দেবো না—এই ত? বেশ, তাই হবে। এখন আপনি আসুন, নমস্কার।

নমস্কার মশাই, নমস্কার। হবেই ত, হবেই ত। আপনার ঠাকুর হলেন লক্ষপতি! প্রাতঃস্মরণীয় লোক, নাম করলে সুপ্রভাত হয়।

তা হয়। আপনি এখন আসুন।

আসি মশাই, আসি—নমস্কার! বলিয়া ত্রিলোচন প্রস্থান করিলেন।

লোকটি চলিয়া গেলে বিজয় চুপ করিয়া বসিয়া নিজেকে বুঝাইতেছিল যে তাহার মাথা-ব্যথা করিবার কি আছে? বস্তুতঃ এ ছাড়া মেয়েটিরই বা উপায় কি? ব্যাপারটা অভাবিত-পূর্ব্বও নয়, সংসারে ঘটে না তাও নয়, তবে তাহার দুশ্চিন্তা কিসের? হঠাৎ বিনোদ ঘোষের কথা মনে পড়িল, সেদিন সে বলিতেছিল অনুরাধা দাদার সঙ্গে এই বলিয়া ঝগড়া করিয়াছে যে কুলের

গৌরব লইয়া সে কি করিবে, সহজে দুটা খাইতে পরিতে যদি পায় সেই যথেষ্ট।

প্রতিবাদে গগন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তুই কি বাপ-পিতামর নাম ডোবাতে চাস? অনুরাধা জবাব দিয়াছিল, তুমি তাদের বংশধর, নাম বজায় রাখতে পারো রেখো আমি পারবো না।

এ কথার বেদনা বিজয় বুঝিল না, নিজেও সে যে কৌলীন্য-সম্মান এতটুকু বিশ্বাস করে তাও না, কিন্তু তবুও তাহার সহানুভূতি গিয়া পড়িল গগনের পরে এবং অনুরাধার তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর যতই সে মনে মনে তোলপাড় করিতে লাগিল ততই তাহাকে লজ্জাহীন, লোভী ও হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এদিকে উঠানে ক্রমশঃ লোক জমিতেছে, এইবার তাহাদিগকে লইয়া কাজ সুরু করিতে হইবে, কিন্তু আজ তাহার কিছুই ভালো লাগিল না। দরওয়ানকে দিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিল এবং একাকী বসিয়া থাকিতে না পারিয়া কি ভাবিয়া সে একেবারে বাটীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। রান্নাঘরের সম্মুখে খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অনুরাধা শুইয়া, তাহার দুই পাশে দুই ছেলে কুমার ও সন্তোষ—মহাভারতের গল্প চলিতেছে; রাত্রের রান্নাটা বেলা-বেলি সারিয়া লইয়া নিত্যই সে এমনি ছেলেদের লইয়া সন্ধ্যার পরে গল্প করে, তার পরে কুমারকে খাওয়াইয়া বাহিরে তাহার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেয়। জ্যোৎস্না রাত্রি, ঘন-পল্লব আম গাছের ফাঁক দিয়া আসিয়া টুকরা চাঁদের আলো স্থানে স্থানে তাহাদের গায়ের পরে মুখের পরে পড়িয়াছে,

গাছের ছায়ায় একটা লোককে এদিকে আসিতে দেখিয়া অনুরাধা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ?

আমি বিজয়।

তিনজনেই শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। সন্তোষ ছোটবাবুকে অত্যন্ত ভয় করে, প্রথম দিনের স্মৃতি সে ভুলে নাই, উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিয়া গেল, কুমারও বন্ধুর অনুসরণ করিল।

বিজয় বলিল, ত্রিলোচন গাঙ্গুলিকে আপনি চেনেন। আজ তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।

অনুরাধা বিস্মিত হইল—আপনার কাছে? কিন্তু আপনি ত তাঁর খাতক নন।

না। কিন্তু হ'লে হয়ত আপনার সুবিধে হ'ত, আমার একদিনের অত্যাচার আপনি আর একদিন শোধ দিতে পারতেন।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল। বিজয় বলিল, তিনি জানিয়ে গেলেন আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছে। এ কি সত্য ?

হাঁ।

আপনি নিজে উপযাচক হয়ে তাঁকে রাজি করিয়েছেন ?

হাঁ তাই।

তাই যদি হয়ে থাকে এ অত্যন্ত লজ্জার কথা। শুধু আপনার নয় আমারও।

আপনার লজ্জা কিসের ?

সেই কথা জানাতেই আমি এসেছি। ত্রিলোচন বলে গেলো শুধু আমার তাড়াতেই বিভ্রান্ত হয়ে নাকি আপনি এই প্রস্তাব করেচেন। বলেছেন আপনার দাঁড়াবার স্থান নেই এবং বহু

সাধ্য-সাধনায় তাকে সম্মত করিয়াছেন, নইলে এ বয়সে বিবাহের ইচ্ছে সে ত্যাগ করেছিল। শুধু আপনার কান্না-কাটিতে দয়া করে ত্রিলোচন রাজি হয়েছে।

হাঁ এ সবই সত্যি।

বিজয় কহিল, আমার তাড়া দেওয়া আমি প্রত্যাহার করচি এবং নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল। বিজয় বলিল, এবার নিজের তরফ থেকে আপনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।

না, সে হয় না। আমি কথা দিয়েছি—সবাই শুনেছে—লোকে তাঁকে উপহাস করবে।

এতে করবে না? বরঞ্চ ঢের বেশি করবে। তার উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাদ বাধবে, তাদের সংসারে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, আপনার নিজের অশান্তির সীমা থাকবে না, এসব কথা কি ভেবে দেখেন নি?

অনুরাধা মৃদু কণ্ঠে বলিল, দেখেচি। আমার বিশ্বাস এ সব কিছুই হবে না।

শুনিয়া বিজয় অবাক হইয়া গেল, কহিল, সে বৃদ্ধ কটা দিন বাঁচবে আশা করেন?

অনুরাধা বলিল, স্বামীর পরমায়ু সংসারে সকল স্ত্রীই বেশী আশা করে, এমনও হতে পারে হাতের নোয়া নিয়ে আমি আগে চলে যাবো।

বিজয় এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কাটিলে অনুরাধা বিনীত স্বরে কহিল, আপনি আমাকে চলে যেতে হুকুম করেছেন সত্যি, কিন্তু

কোনদিন তার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নি। দয়ার যোগ্য নই তবু যথেষ্ট দয়া করেছেন, মনে মনে আমি যে কত কৃতজ্ঞ তা জানাতে পারি নে।

বিজয়ের কাছে উত্তর না পাইয়া সে বলিতে লাগিল, ভগবান জানেন আপনার বিরুদ্ধে কারো কাছে আমি একটা কথাও বলি নি। বললে আমার অন্যায় হ'তো, আমার মিছে কথা হ'তো। গাঙ্গুলিমশায় যদি কিছু বলে থাকেন সে তাঁর নিজের কথা আমার নয়। তবু তাঁর হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কবে বিয়ে, তেরই জ্যৈষ্ঠ? তা হ'লে প্রায় মাস-খানেক বাকি রইল—না?

হাঁ তাই।

এর আর পরিবর্ত্তন নেই বোধকরি?

বোধহয় নেই। অন্ততঃ সেই ভরসাই তিনি দিয়ে গেছেন।

বিজয় বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তা হ'লে আর কিছু আমার বলবার নেই, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটা একবার ভেবে দেখলেন না আমার এই বড় পরিতাপ।

অনুরাধা বলিল, একবার নয় একশোবার ভেবে দেখেচি ছোটবাবু। এই আমার রাত্রিদিনের চিন্তা। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সত্যিই ভাষা খুঁজে পাই নে কিন্তু আপনি নিজে একবার আমার সব কথা ভেবে দেখুন দিকি। অর্থ নেই, রূপ নেই, গৃহ নেই, অভিভাবকহীন একাকী পল্লীগ্রামের অনাচার অত্যাচার থেকে কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার স্থান নেই—বয়স হ'লো তেইশ-চব্বিশ—ইনি ছাড়া আমাকে কে

বিয়ে করতে চাইবে বলুন ত ? তখন অন্নের জন্য কার কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াবো ? শুনে আপনারই বা কি মনে হবে ?

এ সবই সত্য, প্রতিবাদে কিছুই বলিবার নাই। মিনিট-দুই তিন নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া বিজয় গভীর অনুতাপের সহিত বলিল, এ সময়ে আপনার কি আমি কোন উপকারই করতে পারি নে ? পারলে খুসি হবো !

অনুরাধা কহিল, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন যা কেউ করতো না। আপনার আশ্রয়ে আমি নির্ভয়ে আছি—ছেলে দুটি আমার চন্দ্র সূর্য্যি—এই আমার ঢের। আপনার কাছে প্রার্থনা শুধু মনে মনে আর আমাকে আমার দাদার দোষের ভাগী করে রাখবেন না, আমি জেনে কোন অপরাধ করি নি।

সে আমি জানতে পেরেছি আপনাকে বলতে হবে না। বলিয়া বিজয় ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

৫

কলিকাতা হইতে কিছু তরি-তরকারি ও ফল-মূল মিষ্টান্ন আসিয়াছিল, বিজয় চাকরকে দিয়া ঝুড়িটা আনিয়া রান্নাঘরের সুমুখে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ঘরে আছেন নিশ্চয়ই—

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে সাড়া আসিল, আছি।

বিজয় বলিল, মুস্কিল হয়েছে আপনাকে ডাকার ; আমাদের সমাজে হ'লে মিস্ চ্যাটার্জ্জি কিম্বা মিস্ অনুরাধা বলে অনায়াসে ডাকা চলতো কিন্তু এখানে তা অচল। আপনার ছেলে দুটোর

কেউ উপস্থিত থাকলে তোদের 'মাসিকে ডেকে দে' বলে কাজ চালাতুম কিন্তু তারাও ফেরার। কি বলে ডাকি বলুন ত ?

অনুরাধা দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, আপনি মনিব আমাকে রাধা বলে ডাকবেন।

বিজয় বলিল, ডাকতে আপত্তি নেই কিন্তু মনিবানা-সত্ত্বের জোরে নয়। দায় ছিল গগন চাটুয্যের কিন্তু সে দিলে গা ঢাকা ; মনিব বলে আপনি কেন মানতে যাবেন ? আপনার গরজ কিসের।

ভিতর হইতে শুধু শোনা গেল, ও কথা বলবেন না, আপনি মনিব বই কি ?

বিজয় বলিল, সে দাবি করি নে কিন্তু বয়সের দাবী করি। আমি অনেক বড় ; নাম ধরে ডাকলে যেন রাগ করবেন না।

না।

বিজয় এটা দেখিয়াছে যে ঘনিষ্ঠতা করার আগ্রহ তাহার দিক দিয়া যত প্রবলই হোক ও-পক্ষ হইতে লেশমাত্র নাই। সে কিছুতে সুমুখে আসে না এবং সংক্ষেপে ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বরাবরই আড়াল হইতে উত্তর দেয়।

বিজয় বলিল, বাড়ী থেকে কিছু তরি-তরকারি, কিছু ফল-মূল মিষ্টি এসে পৌঁছেচে। ঝুড়িটা তুলে রাখুন ছেলেদের দেবেন !

থাক্। দরকার মতো রেখে আপনার বাইরে পাঠিয়ে দেবো।

না, সে করবেন না। আমার বামুনটা রাঁধতেও জানে না, দুপুর থেকে দেখ্‌চি চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। কি জানি আপনাদের দেশের ম্যালেরিয়া তাকে ধরলে কি না। তা হ'লে ভোগাবে।

কিন্তু ম্যালেরিয়া ত আমাদের দেশে নেই। বামুন না উঠলে এবেলা আপনার রাঁধবে কে ?

বিজয় বলিল, এ-বেলার কথা ছেড়ে দিন, ভেবে দেখবো কাল সকালে। আর কুকারটা ত সঙ্গে আছেই শেষ পর্য্যন্ত চাকরকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারবো।

কিন্তু তাতে কষ্ট হবে ত ?

না। নিজের অভ্যাসে আছে, শুধু কষ্ট হতে পারতো ছেলের খাবার কষ্ট চোখে দেখলে। কিন্তু সে ভার ত আপনি নিয়েছেন। কি রাঁধচেন এ বেলা ? ঝুড়িটা খুলে দেখুন না যদি কাজে লাগে।

কাজে লাগবে বই কি। কিন্তু এ বেলা আমার রান্না নেই।

নেই ? কেন ?

কুমারের একটু গা গরম হয়েছে, রাঁধলে সে খাবার উপদ্রব করবে। ও-বেলার যা আছে তাতে সন্তোষের চলে যাবে।

গা গরম হয়েছে তার ? কোথায় আছে সে ?

আছে আমার বিছানায় শুয়ে—সন্তোষের সঙ্গে গল্প করচে। আজ বলছিলো বাইরে যাবে না আমার কাছে শোবে।

বিজয় বলিল, তা শুক কিন্তু বেশি আদর পেলে মাসিকে ছেড়ে ও বাড়ী যেতে চাইবে না। তখন ওকে নিয়ে বিভ্রাট বাধবে।

না, বাধবে না। কুমার অবাধ্য ছেলে নয়।

বিজয় বলিল, কি হলে অবাধ্য হয় সে আপনি জানেন, কিন্তু শুনতে পাই আপনার পরে ও কম উৎপাত করে না।

অনুরাধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও উপদ্রব যদি করে আমার ওপরেই করে আর কারো ওপরে না।

বিজয় বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু মাসিই না হয় সহ্য করলে কিন্তু জ্যাঠাইমা সইবে না। তার বিমাতা যদি আসেন তিনি এতটুকু অত্যাচারও বরদাস্ত করবেন না। অভ্যাস বিগ্‌ড়লে ওর বিপদ ঘটবে যে।

ছেলের বিপদ ঘটবে এমন বিমাতা ঘরে আনবেন কেন? না-ই বা আনলেন।

বিজয় বলিল, আনতে হয় না, ছেলের কপাল ভাঙলে বিমাতা আপনি এসে ঘরে ঢোকেন। তখন বিপদ ঠ্যাকাতে মাসির শরণাপন্ন হতে হয়, অবশ্য তিনি যদি রাজি হন।

অনুরাধা বলিল, যার মা নেই মাসি তাকে ফেলতে পারে না। যত দুঃখে হোক মানুষ করে তোলেই।

কথাটা শুনে রাখলুম, বলিয়া বিজয় চলিয়া যাইতেছিল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যদি অবিনয় না মনে করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

করুন।

কুমারের চিন্তা পরে করা যাবে কারণ তার বাপ বেঁচে আছে। তাকে যত পাষণ্ড লোকে ভাবে সে তা নয়। কিন্তু সন্তোষ? তার ত বাপ মা দুই-ই গেছে, নতুন মেসো ত্রিলোচনের ঘরে যদি তার ঠাঁই না হয় কি করবেন তাকে নিয়ে? ভেবেচেন সে কথা?

অনুরাধা বলিল, মাসির ঠাঁই হবে বোনপোর হবে না?

হওয়াই উচিত, কিন্তু যে-টুকু তাঁর দেখতে পেলুম তাতে ভরসা বড় হয় না।

এ কথার জবাব অনুরাধা তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না, ভাবিতে একটু সময় লাগিল, তারপরে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তখন গাছ-তলায় দুজনের স্থান হবে। সে কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

বিজয় বলিল, মাসির যোগ্য কথা অস্বীকার করি নে কিন্তু সে সম্ভব নয়। তখন আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দেবেন। কুমারের বন্ধু ও, সে যদি মানুষ হয় সন্তোষও হবে।

ভিতর হইতে আর কোন জবাব আসিল না, বিজয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন পরে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সন্তোষ বলিল, মাসিমা আপনাকে খেতে ডাকচেন।

আমাকে ?

হাঁ, বলিয়াই সে প্রস্থান করিল।

অনুরাধার রান্নাঘরে খাবার ঠাঁই করা। বিজয় আসনে বসিয়া বলিল, রাত্রিটা অনায়াসে কেটে যেতো, কেন আবার কষ্ট করলেন ?

অনুরাধা অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিল, চুপ করিয়া রহিল।

ভোজ্যবস্তুর বাহুল্য নাই কিন্তু যত্নের পরিচয় প্রত্যেকটি জিনিসে। কি পরিপাটি করিয়াই না খাবারগুলি সাজানো। আহারে বসিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, কুমার কি খেলে ?

সাগু খেয়ে সে ঘুমিয়েছে।

ঝগড়া করে নি আজ ?

অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমার কাছে শোবে বলে আজ ও ভারি শান্ত। মোটে ঝগড়া করে নি।

বিজয় বলিল, ওকে নিয়ে আপনার ঝঞ্ঝাট বেড়েছে কিন্তু আমার দোষে নয়। ও নিজেই কি ক'রে যে আপনার সংসারের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো তাই আমি ভাবি।

আমিও ঠিক তাই ভাবি।

মনে হয় ও বাড়ী চলে গেলে আপনার কষ্ট হবে।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, নিয়ে যাবার আগে কিন্তু আপনাকে একটী কথা দিয়ে যেতে হবে। আপনাকে চোখ রাখতে হবে ও যেন কষ্ট না পায়।

কিন্তু আমি ত থাকি বাইরে নানা কাজে ব্যস্ত, কথা রাখতে পারবো বলে ভরসা হয় না।

তা হলে আমার কাছে ওকে দিয়ে যেতে হবে।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে সে আরও অসম্ভব। বলিয়া বিজয় হাসিয়া খাওয়ায় মন দিল। একসময়ে বলিল, আমার বৌদিদিদের আসার কথা ছিল কিন্তু তাঁরা বোধকরি আর এলেন না।

কেন ?

যে-খেয়ালে বলেছিলেন সম্ভবতঃ সেটা গেছে। সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে সহজে পা বাড়াতে চান না। একপ্রকার ভালোই হয়েছে। একা আমিই ত আপনার যথেষ্ট অসুবিধে ঘটিয়েছি তাঁরা এলে সেটা বাড়তো।

অনুরাধা একথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ বলা আপনার অন্যায়। বাড়ী আমার নয় আপনাদের। তবু আমিই সমস্ত যায়গা জুড়ে বসে থাকবো তাঁরা এলে রাগ করবো এর চেয়ে অন্যায় হতেই পারে না। আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবা আমার প্রতি সত্যিই

আপনার অবিচার। যত দয়া আমাকে করেছেন আমার দিক থেকে এই কি তার প্রতিদান ?

এত কথা এমন করিয়া সে কখনো বলে নাই। জবাব শুনিয়া বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল—যতটা অশিক্ষিত এই পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে সে ভাবিয়াছিল তাহা নয়। একটুখানি স্থির থাকিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল, সত্যিই একথা বলা আমার উচিত হয় নি। যাদের সম্বন্ধে একথা খাটে আপনি তাদের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দু-তিন দিন পরেই আমি বাড়ী চলে যাবো, এখানে এসে প্রথমে আপনার প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করেচি কিন্তু সে না জানার জন্যে। অথচ সংসারে এমনিই হয়, এমনিই ঘটে। তবু যাবার আগে আমি গভীর লজ্জার সঙ্গে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করি।

অনুরাধা মৃদুকণ্ঠে বলিল, ক্ষমা আপনি পাবেন না।

পাব না ? কেন ?

এসে পর্য্যন্ত যে অত্যাচার করেছেন তার ক্ষমা নেই, বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল। প্রদীপের স্বল্প আলোকে তাহার হাসি-মুখ বিজয়ের চোখে পড়িল এবং মুহূর্ত্ত কালের এক অজানা বিস্ময়ে সমস্ত অন্তরটা দুলিয়া উঠিয়াই আবার স্থির হইল। ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বলিল, সেই ভালো, ক্ষমায় কাজ নেই। অপরাধী বলেই যেন চিরকাল মনে পড়ি।

উভয়েই নীরব। মিনিট দুই-তিন ঘরটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিল অনুরাধা। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আবার কবে আসবেন ?

মাঝে মাঝে আসতেই হবে জানি, যদিচ দেখা আর হবে না।

ও-পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ আসিল না, বুঝা গেল ইহা সত্য।

খাওয়া শেষ হইলে বিজয় বাহিরে যাইবার সময়ে অনুরাধা বলিল, ঝুড়িটায় অনেক রকম তরকারি আছে কিন্তু বাইরে আর পাঠালুম না। কাল সকালেও আপনি এখানেই খাবেন।

তথাস্তু। কিন্তু বুঝেছেন বোধ করি সাধারণের চেয়ে ক্ষিদেটা আমার বেশি। নইলে প্রস্তাব করতুম শুধু সকালে নয়, নেমন্তন্নর মেয়াদটা বাড়িয়ে দিন যে-কটা দিন থাকি। আপনার হাতে খেয়েই যেন বাড়ী চলে যেতে পারি।

উত্তর আসিল, সে আমার সৌভাগ্য।

পরদিন প্রভাতেই বহুবিধ আহার্য্য দ্রব্য অনুরাধার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া পৌছিল। সে আপত্তি করিল না তুলিয়া রাখিল।

ইহার পরে তিনদিনের স্থলে পাঁচদিন কাটিল। কুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এই কয়দিন বিজয় ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিল যে আতিথ্যের ত্রুটি কোনদিকে নাই, কিন্তু পরিচয়ের দূরত্ব তেমনি অবিচলিত রহিল কোন ছলেই তিলার্দ্ধ সন্নিকটবর্ত্তী হইল না। বারান্দায় খাবার যায়গা করিয়া দিয়া অনুরাধা ঘরের মধ্যে হইতে সাজাইয়া গুছাইয়া দেয়, পরিবেশন করে সন্তোষ। কুমার আসিয়া বলে, বাবা, মাসিমা বললেন মাছের তরকারিটা অতখানি পড়ে থাকলে চলবে না আর একটু খেতে হবে। বিজয় বলে, তোমার মাসিমাকে বলো গে বাবাকে রাক্ষস ভাবা তাঁর অন্যায়। কুমার ফিরিয়া আসিয়া বলে, মাছের তরকারি থাক ও বোধহয় ভালো হয়

নি। কিন্তু কালকের মতো বাটিতে দুধ পড়ে থাকলে তিনি দুঃখ করবেন। বিজয় শুনাইয়া বলিল, তোমার মাসি যেন কাল থেকে গামলার বদলে বাটিতে করেই দুধ দেন তা হ'লে পড়ে থাকবে না।

৬

এমনি করিয়া এই পাঁচটা দিন কাটিল। মেয়েদের যত্নের ছবিটা বিজয়ের মনে ছিল চিরদিনই অস্পষ্ট, মাকে সে ছেলে-বেলা হইতে অসুস্থ ও অপটু দেখিয়াছে, গৃহিণীপণার কোন কর্ত্তব্যই তিনি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই—নিজের স্ত্রীও ছিল মাত্র বছর-দুই জীবিত—তখন তাহার পাঠ্যাবস্থা—ইহার পর হইতে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল সুদূর প্রবাসে। সেদিকের অভিজ্ঞতার ভালোমন্দ অনেক স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে পড়ে কিন্তু সমস্তই যেন অবাস্তব বইয়ে পড়া কল্পিত কাহিনী। জীবনের সত্য প্রয়োজনে একেবারে সম্বন্ধ বিহীন।

আর আছে তাহার দাদার স্ত্রী প্রভাময়ী। যে-পরিবারে বৌদিদির বিচার চলে, ভালোমন্দর আলোচনা হয়, সে-পরিবার তাহাদের নয়। মাকে অনেকদিন কাঁদিতে দেখিয়াছে, বাবা বিরক্ত ও বিমর্ষ হইয়াছেন কিন্তু এসকল সে নিজেই অসঙ্গত ও অনধিকার চর্চ্চা মনে করিয়াছে। জ্যাঠাইমা দেবর-পুত্রের খোঁজ না রাখিলে, বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা না করিলে যে প্রচণ্ড অপরাধ হয় এ ধারণা তাহার নয়। তাহার নিজের স্ত্রীকেও অনুরূপ আচরণ করিতে দেখিলে সে যে মর্ম্মাহত হইত তাহাও নয়। কিন্তু

তাহার এতকালের ধারণাকে এই শেষের পাঁচটা দিন যেন ধাক্কা দিয়া নড়বড়ে করিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে তাহারা যাত্রা করিবার সময়, চাকর জিনিস-পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত করিতেছে, আর ঘণ্টা-কয়েক মাত্র দেরি, সন্তোষ আসিয়া আড়াল হইতে বলিল, মাসিমা খেতে ডাকছেন।

এমন সময়ে ?

হাঁ, বলিয়াই সে সরিয়া পড়িল।

বিজয় ভিতরে আসিয়া দেখিল যথারীতি বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, মাসির গলা ধরিয়া কুমার ঝুলিতেছিল তাহার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনুরাধা রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

আসনে বসিয়া বিজয় কহিল, এ কি ব্যাপার !

ভিতর হইতে অনুরাধা বলিল, দুটি খিচুড়ি রেঁধে রেখেচি খেতে বসুন।

জবাব দিতে গিয়া আজ বিজয়কে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইল, কহিল, অসময়ে কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন ? আর যদি করলেন খান-কতক লুচি ভেজে দিলেই হ'তো।

অনুরাধা কহিল, লুচি ত আপনি খান না। বাড়ী পৌঁছতে রাত্রি দুটো-তিনটে বাজবে, না খেয়ে উপোস করে গেলেই কি কষ্ট আমার কম হবে ? কেবলি মনে পড়বে ছেলেটা না খেয়ে গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিজয় নীরবে কিছুক্ষণ আহার করিয়া বলিল, বিনোদকে বলে

গেলুম সে যেন আপনাকে দেখে। যে-কটা দিন এ বাড়ীতে আছেন যেন অসুবিধে কিছু না হয়।

সে আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, আর একটা কথা জানিয়ে যাই। যদি দেখা হয় গগনকে বলবেন আমি তাকে মাপ করেচি, কিন্তু এ গাঁয়ে যেন আর না সে আসে। এলে ক্ষমা করবো না।

কখনো দেখা হ'লে তাঁকে জানাবো, বলিয়া অনুরাধা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, মুস্কিল হয়েছে কুমারকে নিয়ে। আজ সে কিছুতে যেতে চাচ্চে না। অথচ কেন যে চাচ্চে না তাও বলে না।

বিজয় কহিল, বলতে চায় না নিজেই জানে না বলে। অথচ মনে মনে বোঝে সেখানে গেলে ওর কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে কেন ?

সে বাড়ীর নিয়ম ওই। কিন্তু হ'লেই বা কষ্ট, এর মধ্যে দিয়েই ত ও এত বড় হ'লো।

তা হ'লে গিয়ে কাজ নেই। থাক আমার কাছে।

বিজয় সহাস্যে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বড়-জোর এই মাসটা তার বেশি ত থাকতে পারবে না—তাতে লাভ কি ?

উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। অনুরাধা বলিল, ওর বিমাতা যিনি আসবেন শুনেচি তিনি শিক্ষিতা মেয়ে।

হাঁ, তিনি বি-এ পাশ করেছেন।

কিন্তু বি-এ পাশ ত ওর জ্যাঠাইমাও করেছেন।

নিশ্চয় করেছেন। কিন্তু বি-এ পাশের কেতাবের মধ্যে

দেওরপোকে যত্ন করার কথা লেখা নেই ! সে পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয় নি।

কিন্তু রুগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ী ? সে কথাও কি কেতাবে লেখে না ?

না। এ প্রস্তাব আরও হাস্যকর।

হাস্যকর নয় এমন কি কিছু আছে ?

আছে। বিন্দুমাত্র অনুযোগ না করাই হচ্চে আমাদের সমাজের সুভদ্র বিধি।

অনুরাধা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, এ বিধি আপনাদেরই থাক। কিন্তু যে-বিধি সকলের সমান সে হচ্চে এই যে ছেলের চেয়ে বি-এ পাশ বড় নয়। এমন মেয়েকে ঘরে আনা অনুচিত।

কিন্তু আনতে কাউকে ত হবেই। যে-দলের আব্‌হাওয়ার মধ্যে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে বি-এ পাশ নইলে মানও বাঁচে না মনও বোঝে না ; এবং বোধহয় ঘরও চলে না। মা-বাপ-মরা বোনপোর জন্যে গাছতলা স্বীকার করে নিতে চায় এমন মেয়ে নিয়ে আমাদের বনবাস করা চলে কিন্তু সমাজে বাস করা চলে না।

অনুরাধার কণ্ঠস্বর পলকের জন্য তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—না, সে হবে না। একজন নির্দ্দয় বিমাতার হাতে তুলে দিতে ওকে আপনি পারবেন না।

বিজয় কহিল, সে ভয় নেই। কারণ তুলে দিলেও হাত থেকে আপনিই গড়িয়ে কুমার নীচে এসে পড়বে। কিন্তু তাই বলে তিনি নির্দ্দয়ও নন, এবং আমার ভাবী-পত্নীর স্বপক্ষে আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। মার্জ্জিত-রুচি-সম্মত উদাস অবহেলায়

তাঁদের নেতিয়ে-পড়া-আত্মীয়তার বর্ব্বরতার লেশ নাই। ও দোষটা দেবেন না।

অনুরাধা হাসিয়া বলিল, প্রতিবাদ যত খুসি করুন কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নৈতিয়ে-পড়া-আত্মীয়তার মানেটা হ'লো কি?

বিজয় বলিল, ও আমাদের বড় সার্কলের পারিবারিক বন্ধন! ওর কোড আলাদা, চেহারা স্বতন্ত্র। শেকড় টানে না রস, পাতার রঙ সবুজ না হতেই ধরে হলুদের বর্ণ। আপনি পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, ইস্কুল কলেজে পড়ে পাশ করেন নি, পার্টিতে পিক্‌নিকে মেশেন নি, ওর নিগূঢ় অর্থ আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না, কেবল এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি কুমারের বিমাতা এসে তাকে বিষ খাওয়াবার আয়োজনও করবেন না, চাবুক হাতে তাড়া করেও বেড়াবেন না। কারণ সে মার্জ্জিত রুচি-বিরুদ্ধ, আচরণ। সুতরাং সে দিকে নির্ভয় হতে পারেন।

অনুরাধা বলিল, আমি তাঁর কথা ছেড়ে দিলুম কিন্তু আপনি নিজে দেখবেন কথা দিন। এই আমার মিনতি।

বিজয় কহিল, কথা দিতেই ইচ্ছে করে কিন্তু আমার স্বভাবও আলাদা, অভ্যাসও আলাদা। আপনার আগ্রহ স্মরণ করে মাঝে মাঝে দেখবার চেষ্টা করবো কিন্তু যতটা আপনি চান তা পেরে উঠবো মনে হয় না। কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হ'লো এখন যাই। যাবার উদ্যোগ করি গে। বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, কহিল, রইলো কুমার আপনার কাছে, ওকে ছাড়বার দিন এলে দেবেন বিনোদকে দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে। প্রয়োজন হয় অসঙ্কোচে সন্তোষকেও সঙ্গে দেবেন। প্রথমে এসে যে ব্যবহার করেচি ঠিক

সেই আমার প্রকৃতি নয়। এ ভরসা আর একবার দিয়ে চললুম—আমার বাড়ীতে কুমারের চেয়ে বেশি অনাদর সন্তোষের ঘটবে না।

বাড়ীর সম্মুখে ঘোড়ার-গাড়ী দাঁড়াইয়া, জিনিস-পত্র বোঝাই দেওয়া হইয়াছে, বিজয় উঠিতে যাইতেছে কুমার বলিল, বাবা, মাসিমা ডাকচেন একবার।

সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুরাধা কহিল, প্রণাম করবো বলে ডেকে পাঠালুম, আবার কবে যে করতে পারবো জানি নে। বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমারকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ঠাকুরমাকে ভাবতে বারণ করবেন! যে-কটাদিন ছেলেটা আমার কাছে রইলো অযত্ন হবে না।

বিজয় হাসিয়া বলিল, বিশ্বাস করা কঠিন।

কঠিন কার কাছে? আপনার কাছেও নাকি? বলিয়া সেও হাসিতে গিয়া দুজনের চোখো-চোখি হইল, বিজয় স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার চোখের পাতা দুটি জলে ভিজা। মুখ নামাইয়া বলিল, কুমারকে নিয়ে গিয়ে কিন্তু কষ্ট দেবেন না যেন। আর বলতে পাবো না বলেই বার বার করে বলে রাখচি। আপনাদের বাড়ীর কথা মনে হ'লে ওকে পাঠাতে আমার ইচ্ছে হয় না।

না-ই বা পাঠালেন।

প্রত্যুত্তরে সে শুধু একটা নিশ্বাস চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, যাবার পূর্ব্বে আপনার প্রতিশ্রুতির কথাটা আর

একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই। কথা দিয়েছেন কখনো কিছু প্রয়োজন হলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবেন।

আমার মনে আছে। জানি, গাঙ্গুলিমশায়ের কাছে ভিক্ষুকের মতোই আমাকে চাইতে হবে, মনের সমস্ত ধিক্কার বিসর্জ্জন দিয়েই চাইতে হবে কিন্তু আপনার কাছে তা নয়। যা চাইবো স্বচ্ছন্দে চাইবো।

কিন্তু মনে থাকে যেন, বলিয়া বিজয় যাইতে উদ্যত হইলে সে কহিল, তবে আপনিও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। বলুন প্রয়োজন হলে আমাকেও জানাবেন।

জানাবার মতো আমার কি প্রয়োজন হবে অনুরাধা ?

তা কি করে জানবো। আমার আর কিছু নেই কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রাণ-দিয়ে সেবা করতেও ত পারবো।

আপনাকে ওরা করতে দেবে কেন ?

আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

৭

কুমার আসে নাই শুনিয়া মা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—সে কি কথা রে ! যার সঙ্গে ঝগড়া তার কাছেই ছেলে রেখে এলি ?

বিজয় বলিল, যার সঙ্গে ঝগড়া সে গিয়ে পাতালে ঢুকেছে মা, তাকে খুঁজে বার করে কার সাধ্য ? তোমার নাতি রইলো তার মাসির কাছে। দিন কয়েক পরেই আসবে ?

হঠাৎ মাসি এলো কোথা থেকে রে ?

বিজয় বলিল, ভগবানের তৈরি সংসারে হঠাৎ কে যে কোথা থেকে এসে পৌঁছায় মা, কেউ বলতে পারে না। যে তোমার টাকা-কড়ি নিয়ে ডুব মেরেছে এ সেই গগন চাটুয্যের ছোটবোন। বাড়ী থেকে একেই তাড়াবো বলে লাঠি-সোটা পিয়াদা-পাইক নিয়ে রণ-সজ্জায় যাত্রা করেছিলুম কিন্তু তোমার আপনার নাতিই করলে গোল। এমনি তার আঁচল চেপে রইলো যে দুজনকে একসঙ্গে না তাড়ালে আর তাড়ানো চললো না।

মা ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার বুঝি তার খুব অনুগত হয়ে পড়েচে? মেয়েটা খুব যত্ন-আত্মী করে বুঝি? বাছা যত্ন ত কখনো পায় না। বলিয়া তিনি নিজের অস্বাস্থ্য স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিজয় বলিল, আমি ছিলুম বাইরে বাড়ীতে, ভেতরে কে কাকে কি যত্ন করত দেখি নি কিন্তু আসবার সময়ে কুমার মাসিকে ছেড়ে কিছুতে আসতে চাইলে না।

মার তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না, বলিলেন, ওরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কত রকম জানে। সঙ্গে না এনে ভালো করিস নি বাবা।

বিজয় বলিল, তুমি নিজে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হয়ে পাড়াগাঁয়ের বিরুদ্ধে তোমার এই নালিশ! শেষকালে তোমার বিশ্বাস গিয়ে পড়লো বুঝি সহরের মেয়ের ওপর।

সহরের মেয়ে! তাঁদের চরণে কোটী কোটী নমস্কার! বলিয়া মা দুই হাত এক করিয়া কপালে ঠেকাইলেন।

বিজয় হাসিয়া উঠিল। মা বলিলেন, হাসচিস কি রে, আমার দুঃখ কেবল আমিই জানি আর জানেন তিনি। বলিতে বলিতে

তাঁহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল, কহিলেন, আমরা যখনকার সে পাড়াগাঁ কি আর আছে বাবা? দিন কাল সব বদলে গেছে।

বিজয় বলিল, অনেক বদলেছে, কিন্তু যতদিন তোমরা বেঁচে আছো বোধহয় তোমাদের পুণ্যেই এখনো কিছু বাকি আছে মা, একেবারে লোপ পায় নি। তারই একটুখানি এবারে দেখে এলুম। কিন্তু তোমাকে যে, সে জিনিষ দেখাবার যো নেই এই দুঃখটাই মনে রইলো। বলিয়া সে আফিসে বাহির হইয়া গেল। আফিসের কাজের তাড়াতেই ব্যস্ত হইয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

* * * *

বিকালে আফিস হইতে ফিরিয়া বিজয় ও-মহলে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে বাধিয়াছে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। প্রসাধনের জিনিষ-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, দাদা ইজি-চেয়ারের হাতলে বসিয়া প্রবল কণ্ঠে বলিতেছেন, কখ্খনো না! যেতে হয় একলা যাও। এমন কুটুম্বিতেয় আমি দাঁড়িয়ে—ইত্যাদি।

অকস্মাৎ বিজয়কে দেখিয়া প্রভা হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—ঠাকুরপো, তারা যদি সিতাংশুর সঙ্গে অনিতার বিয়ে ঠিক করে থাকে সে কি আমার দোষ? আজ পাকা-দেখা উনি বলচেন যাবেন না। তার মানে আমাকেও যেতে দেবেন না।

দাদা গর্জিয়া উঠিলেন—তুমি জানতে না বলতে চাও? আমাদের সঙ্গে এ জুচ্চুরি চালাবার এতদিন কি দরকার ছিল!

কথাটা সহসা ধরিতে না পারিয়া বিজয় হতবুদ্ধি হইল, কিন্তু বুঝিতেও বিলম্ব হইল না, কহিল, রোসো রোসো। হয়েছে কি

বলো ত? অনিতার সঙ্গে সিতাংশু ঘোষালের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে। আজই তার পাকা দেখা? I am thrown completely over board!

দাদা হুঙ্কার দিলেন—হুঁ। আর উনি বলতে চান কিছুই জানতেন না!

প্রভা কাঁদিয়া বলিল, আমি কি করতে পারি ঠাকুরপো! দাদা রয়েছেন মা রয়েছেন মেয়ে নিজে বড় হয়েছে তারা যদি কথা ভাঙে আমার দোষ কি?

দাদা বলিলেন, দোষ এই যে তারা ধাপ্পাবাজ ভণ্ড মিথ্যাবাদী। একদিকে কথা দিয়ে আর একদিকে গোপনে টোপ ফেলে বসেছিল। এখন লোকে মুখ টিপে হাসবে—আমি ক্লাবে পার্টিতে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।

প্রভা তেমনি কান্নার সুরে বলিতে লাগিল, এমন ধারা কি আর হয় না? তাতে তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা সে তোমার বোন বলে। আমার শ্বশুর বাড়ীর সবাই জোচ্চোর বলে। তাতে তোমারও একটা বড় অংশ আছে বলে।

দাদার মুখের প্রতি চাহিয়া এবার বিজয় হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া প্রভার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রসন্ন মুখে কহিল, বৌদিদি, দাদা যত গর্জ্জনই করুন আমি রাগ বা দুঃখ ত করবোই না, বরঞ্চ সত্যিই যদি এতে তোমার অংশ থাকে তোমার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ থাকবো। মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাদা, রাগ করা তোমার সত্যিই বড় অন্যায়। এ ব্যাপারে কথা

দেওয়ার কোন অর্থ নেই যদি পরিবর্ত্তনের সুযোগ থাকে। বিয়েটা ত ছেলেখেলা নয়। সিতাংশু আই-সি-এস হয়ে ফিরেচে। সে একটা বড় দরের লোক। অনিতা দেখতে ভালো, বি-এ পাশ করেছে—আর আমি? এখানেও পাশ করি নি, বিলেতেও সাত-আট বচ্ছর কাটিয়ে একটা ডিগ্রি জোগাড় করতে পারি নি—সম্প্রতি কাঠের দোকানে কাঠ বিক্রী করে খাই, না আছে পদ-গৌরব না আছে খেতাব। অনিতা কোন অন্যায় করে নি দাদা।

দাদা সরোষে কহিলেন, একশোবার অন্যায় করেছে। তুই বলতে চাস এতে তোর কোন কষ্টই হয় নি?

বিজয় কহিল, দাদা, তুমি গুরুজন—মিথ্যে বলব না—এই তোমার পা ছুঁয়ে বলচি আমার এতটুকু দুঃখ নেই। নিজের পুণ্যে ত নয়, কার পুণ্যে ঘটলো জানি নে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি বেঁচে গেলুম। বৌদি, চলো আমি তোমাকে নিয়ে যাই। দাদার ইচ্ছে হয় রাগ করে ঘরে বসে থাকুন, কিন্তু আমরা চলো তোমার বোনের পাকা-দেখায় পেট পুরে খেয়ে আসি গে।

প্রভা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করচো ঠাকুরপো?

না বৌদি, ঠাট্টা করি নি। আজ একান্ত মনে তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, তোমার বরে ভাগ্য যেন এবার আমাকে মুখ তুলে চায়। কিন্তু আর দেরি ক'রো না তুমি কাপড় পরে নাও আমিও আফিসের পোষাক ছেড়ে আসি গে। বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল, দাদা বলিলেন, তোর নেমন্তন্ন নেই তুই সেখানে যাবি কি করে?

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা বটে। তারা হয়ত লজ্জা পাবে। কিন্তু বিনা আহ্বানে যে কোথাও যেতেই আজ আমার সঙ্কোচ নেই, ছুটে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্চে, অনিতা, তুমি আমাকে ঠকাও নি, তোমার ওপর আমার রাগ নেই জালা নেই, প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। দাদা, আমার মিনতি রাখো, রাগ করে থেকো না বৌদিদিকে নিয়ে যাও, অন্ততঃ আমার হয়েও অনিতাকে আশীর্ব্বাদ করে এসো তোমরা।

দাদা ও বৌদি উভয়েই হতবুদ্ধির মতো তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল বিজয়ের মুখের পরে বিদ্রূপের সত্যই কোন চিহ্ন নাই, ক্রোধের অভিমানের লেশমাত্র ছায়া কণ্ঠস্বরে পড়ে নাই—সত্যই কোন সুনিশ্চিত বিপদের ফাঁস এড়াইয়া মন তাহার অকৃত্রিম পুলকে ভরিয়া গেছে। বোনের কাছে এ ইঙ্গিত উপভোগ্য নয়, অপমানের ধাক্কায় প্রভার অন্তরটা সহসা জ্বলিয়া গেল, কি যেন একটা বলিতেও চাহিল কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল। বিজয় বলিল, বৌদি, আমার সকল কথা বলবার আজও সময় আসে নি, কখনো আসবে কিনা তাও জানি নে, যদি আসে কোনদিন, সেদিন কিন্তু তুমিও বলবে, ঠাকুরপো, তুমি ভাগ্যবান ভাই। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

সতী

১

হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত ভাল উকিল। কেবল ওকালতি হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও বটে। দেশের সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই সে অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট। সহরের কোন কাজই তাহাকে বাদ দিয়া হয় না। সকালে 'দুর্নীতি-দমন' সমিতির কার্য্যকরী সভার একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেছে, এখন কোন মতে দুটি খাইয়া লইয়া আদালতে পৌঁছিতে পারিলে হয়। বিধবা ছোটবোন উমা কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিল পাছে বেলার অজুহাতে খাওয়ার ত্রুটি ঘটে।

স্ত্রী নির্ম্মলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অদূরে উপবেশন করিল, কহিল, কালকের কাগজে দেখ্‌লাম আমাদের লাবণ্যপ্রভা আসছেন এখানকার মেয়ে-ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস হয়ে।

এই সহজ কথা কয়টির ইঙ্গিত অতীব গভীর।

উমা চকিত হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? তা লাবণ্য নাম এমন ত কত আছে বৌদি!

নির্ম্মলা বলিল, তা আছে। ওঁকে জিজ্ঞেসা করচি।

হরিশ মুখ তুলিয়া সহসা কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি জান্‌বো

কি ক'রে শুনি? গভর্ণমেণ্ট কি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে লোক বাহাল করে নাকি?

স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, আহা, রাগ কর কেন, রাগের কথা ত বলি নি। তোমার তদ্‌বির তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে ত আহ্লাদের কথা। বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি মন্থর মৃদুপদে বাহির হইয়া গেল।

উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না—উঠো না—

হরিশ বিদ্যুৎ-বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল—নাঃ শান্তিতে এক মুঠো খাবারও যো নেই। উঃ! আত্মঘাতী না হলে আর—, বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। যাবার পথে স্ত্রীর মধুর কণ্ঠ কানে গেল, তুমি কোন্ দুঃখে আত্মঘাতী হবে? যে হবে সে একদিন জগৎ দেখ্‌বে।

এখানে হরিশের একটু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন। এখন তাহার বয়স চল্লিশের কম নয়, কিন্তু কম যখন সত্যই ছিল সেই পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস আছে। পিতা রামমোহন তখন বরিশালের সবজজ, হরিশ এম্-এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার মেস্ ছাড়িয়া বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিবেশী ছিলেন হরকুমার মজুমদার। স্কুল-ইন্সপেক্টর। লোকটি নিরীহ, নিরহঙ্কার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসুৎ পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে আসিয়া সদরআলা বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন। অনেকেই আসিতেন। টাক-ওয়ালা মুন্সেফ, দাড়ি ছাঁটা ডেপুটি, মহাস্থবির সহকারী উকিল এবং

সহরের অন্যান্য মান্য-গণ্যের দল সন্ধ্যার পরে কেহই প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাহার কারণ ছিল। সদরআলা নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। অতএব আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হইত ধর্ম্ম সম্বন্ধে। এবং যেমন সর্ব্বত্র ঘটে, এখানেও তেমনি অধ্যাত্ম-তত্ত্বকথার শাস্ত্রীয় মীমাংসা সমাধা হইত খণ্ড যুদ্ধের অবসানে। সেদিন এম্‌নি একটা লড়াইয়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কোনদিন তিনি কোন অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্ম-সমাজ ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হোক, অথবা শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হোক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। তিনি ঘরে ঢুকিতেই টাকওয়ালা মুন্সেফবাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। ইহার কারণ এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা জনরব শুনিয়া আসিয়াছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইঁহার সহিত তর্ক চলে না। সবাই খুসি হইলেন, হইলেন না শুধু সবজজ বাহাদুর নিজে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান কিসের জন্য ? এবং বলিলেনও ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেলে তাঁহার পরম প্রিয় সরকারী উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, শুন্‌লেন ত ভাদুড়ীমশাই। ভূতের মুখে রাম নাম আর কি !

ভাদুড়ী ঠিক সায় দিতে পারিলেন না, কহিলেন, তা বটে! কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্থ। আগে মাষ্টারি কর্‌ত কি না।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন, ও জানার মুখে আগুন। এরাই হ'ল জ্ঞান পাপী। এদের আর মুক্তি নেই।

হরিশ সেদিন চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিল। এই স্বল্পভাষী প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং পিতার অভিমত যাহাই হোক, পুত্র তাহার আসন্ন পরীক্ষা-সমুদ্র হইতে মুক্তি পাইবার ভরসায় তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। সাহায্য করিতে হইবে। হরকুমার সম্মত হইলেন। এইখানে তাঁহার কন্যা লাবণ্যের সহিত হরিশের পরিচয় হইল। সেও আই-এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার গণ্ডগোল ছাড়িয়া পিতার কাছে আসিয়াছিল। সেইদিন হইতে প্রতিদিনই আনাগোনায় হরিশ পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ অংশের অর্থ-ই শুধু জানিল না, আরও একটা জটিলতর বস্তুর স্বরূপ জানিয়া লইল যাহা তত্ত্ব হিসাবে ঢের বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক্! ক্রমশঃ পরীক্ষার দিন কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল, হরিশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষা সে ভালই দিল, এবং ভাল করিয়াই পাশ করিল।

কিছুকাল পরে আবার যখন দেখা হইল হরিশ সমবেদনায় মুখ পাংশু করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ফেল কর্‌লেন যে বড়?

লাবণ্য কহিল, এইটুকুও পার্‌ব না, আমি এতই অক্ষম?

হরিশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা হবার হয়েছে, এবার কিন্তু খুব ভাল করে একজামিন দেওয়া চাই।

লাবণ্য কিছুমাত্র লজ্জা পাইল না, বলিল, খুব ভাল করে দিলেও আমি ফেল হ'ব। ও আমি পারব না।

হরিশ অবাক্ হইল, জিজ্ঞাসা করিল, পারবেন না কি রকম ?

লাবণ্য জবাব দিল, কি রকম আবার কি? এম্‌নি। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ কথাটা হরিশের মাতার কানে গেল।

সেদিন সকালে রামমোহনবাবু মকদ্দমার রায় লিখিতেছেন। যে দুর্ভাগা হারিয়াছে তাহার আর কোথাও কোন কূল-কিনারা না থাকে এই শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে রায়ের মুসাবিধায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দ যোজনা করিতেছিলেন, গৃহিণীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। হরিশ নরহত্যা করিয়াছে শুনিলেও বোধকরি তিনি এতখানি বিচলিত হইতেন না। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি! এত বড়—' ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখে আর যোগাইল না।

দিনাজপুরে থাকিতে একজন প্রাচীন উকীলের সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্ম্মার্থ ও পেন্সনান্তে ৺কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল; একটা ছুটির দিনে গিয়া তাঁহারই ছোটমেয়ে নির্ম্মলাকে আর একবার চোখে দেখিয়া ছেলের বিবাহের পাকা কথা দিয়া আসিলেন।

মেয়েটি দেখিতে ভাল; দিনাজপুরে থাকিতে গৃহিণী তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তথাপি স্বামীর কথা শুনিয়া গালে হাত দিলেন—বল কি গো, একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলে? আজ-কালকার ছেলে—

কর্ত্তা কহিলেন, কিন্তু আমি ত আজ-কালকার বাপ নই? আমি আমার সেকেলে নিয়মেই ছেলে মানুষ করতে পারি। হরিশের পছন্দ যদি না হয় তাকে আর কোন উপায় দেখ্‌তে ব'লো।

গৃহিণী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

কর্ত্তা পুনশ্চ বলিলেন, মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক্‌ ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে, তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে!

খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। হরিশও শুনিল। প্রথমে সে মনে করিল, পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া, কিছু না জুটে, টিউশনি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। পরে ভাবিল সন্ন্যাসী হইবে। শেষে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন, এবং আশীর্ব্বাদের কাজটাও এই সঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন। তাহাদের সমক্ষে রায়বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মের প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, এবং ইংরাজী শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ কীর্ত্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাহাকে হাজার টাকা মাহিনার চাকুরী দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোন গুণ নাই। আজকাল দিন-ক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে,

ছেলেদের ইংরাজি না পড়াইলে চলে না, কিন্তু যে-মূর্খ এই ম্লেচ্ছ বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই।

একা হরকুমার ভিন্ন ইহার নিগূঢ় অর্থ কাহারও অবিদিত রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল, এবং যথাকালে শুভকর্ম্ম সমাধা হইতেও বিঘ্ন ঘটিল না। কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার প্রাক্কালে মৈত্রগৃহিণী—নির্ম্মলার সতী-সাধ্বী মাতাঠাকুরাণী—বধূ-জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন, বলিলেন, মা, পুরুষমানুষকে চোখে চোখে না রাখ্‌লেই সে গেল। সংসার করতে আর যা-ই কেন না ভোল কখনো এ কথাটা ভুলো না।

তাঁহার নিজের স্বামী টিকির গোছা ও শ্রীগীতার মর্ম্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন। আজিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, মৈত্র বুড়া চিতায় শয়ন না করিলে আর তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই।

নির্ম্মলা স্বামীর ঘর করিতে আসিল এবং সেই ঘর আজ বিশ বর্ষ ধরিয়া করিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালে কত পরিবর্ত্তন, কত কি ঘটিল। রায়বাহাদুর মরিলেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মৈত্র গতাসু হইলেন, লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে লাবণ্যর অন্যত্র বিবাহ হইল, জুনিয়ার উকিল হরিশ সিনিয়ার হইয়া উঠিলেন, বয়স তখন যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পড়িল, কিন্তু নির্ম্মলা আর তাহার মাতৃদত্ত মন্ত্র এ জীবনে ভুলিল না।

২

এই সজীব মন্ত্রের ক্রিয়া যে এত সত্বর সুরু হইবে তাহা কে জানিত! রায়বাহাদুর তখনও জীবিত, পেন্সন লইয়া পাবনার বাটীতে আসিয়াছেন। হরিশের এক উকিল-বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন ভাল কীর্ত্তন-ওয়ালী আসিয়াছিল, সে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স কম। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল কাজ-কর্ম্ম অন্তে একদিন ভাল করিয়া তাহার কীর্ত্তন শুনা। পরদিন হরিশের গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হইল; শুনিয়া বাড়ী ফিরিতে একটু অধিক রাত্রি হইয়া গেল।

নির্ম্মলা উপরের খোলা বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, স্বামীকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, গান লাগ্‌লো কেমন?

হরিশ খুসি হইয়া কহিল, খাসা গায়।

দেখ্‌তে কেমন?

মন্দ না, ভালই।

নির্ম্মলা কহিল, তা হ'লে রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই ত পারতে।

এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে হরিশ ক্রুদ্ধ হইবে কি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, কি রকম?

নির্ম্মলা সক্রোধে বলিল, রকম ভালই। আমি কচি খুকি নই, জানি সব, বুঝি সব। আমার চোখে ধূলো দেবে তুমি? আচ্ছা—

উমা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সভয়ে কহিল, তুমি করচ কি বৌদি, বাবা শুনতে পাবেন যে ?

নির্ম্মলা জবাব দিল, পেলেনই বা শুনতে ! আমি ত চুপি চুপি কথা কইচি নে !

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে যে উমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু পাছে তাহার উচ্চস্বরে বৃদ্ধ পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে সে পরক্ষণেই জোড়-হাতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মিনতি করিয়া কহিল, রক্ষে কর বৌদি, এত রাত্রে চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারী ক'রো না।

বধূর কণ্ঠস্বর ইহাতে বাড়িল বই কমিল না, কহিল, কিসের কেলেঙ্কারি। তুমি বলবে না কেন ঠাকুরঝি, তোমার বুকের ভেতরটা ত আর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে না। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

হরিশ কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে নীচে আসিয়া বাকি রাতটুকু মক্কেলদের বসিবার বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইল। অতঃপর দিন-দশেকের মত উভয়ের বাক্যালাপ স্থগিত হইয়া গেল।

কিন্তু হরিশকেও আর সন্ধ্যার পরে বাহিরে পাওয়া যায় না। গেলেও তাহার শঙ্কাকুল ব্যাকুলতা লোকের হাসির বস্তু হইয়া উঠিল। বন্ধুরা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হরিশ, যত বুড়ো হচ্চো, রোগও যে তত বেড়ে যাচ্চে হে ?

হরিশ অধিকাংশ স্থলেই জবাব দিত না, কেবল খোঁচা বেশি

করিয়া বিঁধিলেই বলিত, এই ঘেন্নায় আমাকে যদি তোমরা ত্যাগ করতে পারো ত তোমরাও বাঁচো আমিও বাঁচি।

বন্ধুরা কহিতেন, বৃথা! বৃথা! ওকে লজ্জা দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই লজ্জায় মরি।

৩

সেবার বসন্ত রোগে লোক মরিতে লাগিল খুব বেশি। হরিশকেও রোগে ধরিল। কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন, কহিলেন, মারাত্মক। রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রায়বাহাদুর তখন পরলোকে। হরিশের বৃদ্ধা মাতা আছাড় খাইয়া পড়িলেন, নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া সিঁদুর ঘোচাবে সাধ্যি কার? তোমরা ওকে দেখো আমি চললুম। বলিয়া সে শীতলার মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িল। কহিল, উনি বাঁচেন ত আবার বাড়ী ফিরবো, নইলে এইখানে থেকে ওর সঙ্গে যাবো।

সাতদিনের মধ্যে দেবতার চরণামৃত ভিন্ন কেহ তাহাকে জল পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া বলিলেন, মা, তোমার স্বামী আরোগ্য হয়েছেন, এবার তুমি ঘরে চল।

লোকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা পায়ের ধূলা হইল, তাহার মাথায় থাবা থাবা সিঁদুর ঘষিয়া দিল, কহিল,

মানুষ ত নয়, যেন সাক্ষাৎ মা—। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সাবিত্রীর উপাখ্যান মিথ্যে, না কলিতে ধর্ম্ম গেছে বলেই একেবারে ষোলো আনা গেছে? যমের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

বন্ধুরা লাইব্রেরী ঘরে বলাবলি করিতে লাগিল, সাধে আর মানুষে স্ত্রীর গোলাম হয় হে! বিয়ে ত আমরাও করেছি, কিন্তু এমন নইলে আর স্ত্রী! এখন বোঝা গেল কেন হরিশ সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকত না।

বীরেন উকিল ভক্তলোক, গত বৎসর ছুটিতে কাশী গিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র লইয়া আসিয়াছে, টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত করিয়া কহিল, আমি জানতাম হরিশ মরতেই পারে না। সত্যিকার সতীত্ব জিনিসটা কি সোজা ব্যাপার হে? বাড়ী থেকে বলে গেল, যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই ত—উঃ! শরীর শিউরে উঠে।

তারিণী চাটুয্যের বয়স হইয়াছে, আফিং-খোর লোক, একধারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাইতেছিল, হুঁকাটা বেহারার হাতে দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শাস্ত্রমতে সহধর্ম্মিণী কথাটা ভারি শক্ত; আমার দেখ না কেবল মেয়েই সাতটা। বিয়ে দিতে দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

অনেকদিন পরে ভাল হইয়া আবার যখন হরিশ আদালতে উপস্থিত হইল তখন কত লোকে যে তাহাকে অভিনন্দন করিল তাহার সংখ্যা নাই!

ব্রজেন্দ্রবাবু সখেদে কহিলেন, ভাই হরিশ, স্ত্রৈণ বলে তোমাকে

অনেক লজ্জা দিয়েছি মাপ ক'রো। লক্ষ কেন, কোটী কোটীর মধ্যেও তোমার মত ভাগ্যবান নেই, তুমি ধন্য।

ভক্ত বীরেন বলিল, সীতা সাবিত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দাও, কিন্তু খনা, লীলাবতী, গার্গী আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন। ভাই, স্বরাজ-ফরাজ যাই-ই বল, কিছুতেই হবে না মেয়েদের যতদিন না আবার তেম্‌নি তৈরী করতে পারবো। আমার ত মনে হয় শীঘ্রই পাবনায় একটা আদর্শ নারী শিক্ষা সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এবং যে আদর্শ মহিলা তার পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট হবেন তাঁর নাম ত আমরা সবাই জানি।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে বলিলেন, সেই সঙ্গে একটা পণ-প্রথা নিবারণী সমিতিও হওয়া আবশ্যক। দেশটা ছারখার হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ, তোমার ত ছেলে-বেলায় খাশা লেখার হাত ছিল, তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া।

হরিশ কোন কথারই জবাব দিতে পারিল না কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

৪

মৃত জমিদার গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূর সহিত অন্যান্য পুত্রদের বিষয় সংক্রান্ত মাম্‌লা বাধিয়াছিল। হরিশ ছিল বিধবার উকিল। জমিদারের আম্‌লা কে-যে কোন্ পক্ষে জানা কঠিন বলিয়া গোপনে পরামর্শের জন্য বিধবা নিজেই ইতিপূর্ব্বে দুই-একবার উকিলের

বাড়ী আসিয়াছিলেন। আজ সকালেও তাঁহার গাড়ী আসিয়া হরিশের সদর দরজায় থামিল। হরিশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিজের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইলেন। আলোচনা পাছে ও-ঘরে মুহুরির কানে যায় এই ভয়ে উভয়েই সাবধানে ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিলেন। বিধবার কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্নে হরিশ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়াল হইতে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠের শব্দ আসিল, আমি সব শুনেচি!

বিধবা চমকিয়া উঠিল, হরিশ লজ্জা ও শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেল। এক জোড়া অতি সতর্ক চক্ষু কর্ণ যে তাহাকে অহরহ পাহারা দিয়া আছে, এ কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়াছিল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া নির্ম্মলা রণমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিল, হাত নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল, ফুস্ ফুস্ ক'রে কথা ক'য়ে আমাকে ফাঁকি দেবে? মনেও ক'রো না! কই, আমার সঙ্গে ত কখনো এমন হেসে কথা কইতে দেখি নি!

অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বিধবা সভয়ে কহিল, এ কি কাণ্ড হরিশবাবু!

হরিশ বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পাগল।

নির্ম্মলা কহিল, পাগল? পাগলই বটে। কিন্তু করলে কে শুনি? বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা হাঁটু গাড়িয়া বিধবার পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল। মুহুরি কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, একজন জুনিয়ার উকিল সেইমাত্র আসিয়াছিল সে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, বোস্ কোম্পানির বিল-সরকার তাহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি

মারিতে লাগিল, এবং তাহাদেরই চোখের সম্মুখে নির্ম্মলা মাথা খুঁড়িতে লাগিল—আমি সব জানি! আমি সব বুঝি! থাকো, তোমরাই সুখে থাকো। কিন্তু সতী মায়ের সতী কন্যা যদি হই, যদি মনে-জ্ঞানে এক বই না দুই জেনে থাকি, যদি—

এদিকে বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিল, এ কি ব্যাপার হরিশবাবু! এ কি দুর্নাম দেওয়া—এ কি আমার—

হরিশ কাহারও কোন প্রতিবাদ করিল না। অধোমুখে দাঁড়াইয়া শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হও না কিসের জন্য?

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে সেদিন হরিশ সেই ঘরেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, আদালতে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না। মধ্যাহ্নে উমা আসিয়া বহু সাধ্য-সাধনা এবং মাথার দিব্য দিয়া কিছু খাওয়াইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বামুনঠাকুর রূপার বাটীতে করিয়া খানিকটা জল আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল। হরিশের প্রথমে ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া আজও পায়ের বুড়া আঙুলটা ডুবাইয়া দিল। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্ম্মলা কোন দিন জল স্পর্শ করিত না।

রাত্রে বাহিরের ঘরে একাকী শয়ন করিয়া হরিশ ভাবিতেছিল তাহার এই দুঃখময় দুর্ভর জীবনের অবসান হইবে কবে? এম্নি অনেকদিন অনেক রকমেই ভাবিয়াছে কিন্তু তাহার এই সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোন পথই তাহার চোখে পড়ে নাই।

বছর-দুই গত হইয়াছে। নির্ম্মলা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, খবরের কাগজের খবর ঝুটা নয়। লাবণ্য যথার্থ-ই পাবনায় মেয়ে ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়া আসিতেছে।

আজ হরিশ একটু সকাল সকাল আদালত হইতে ফিরিয়া ছোটবোন উমাকে জানাইল যে, রাত্রের ট্রেণে তাহাকে বিশেষ জরুরি কাজে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ফিরিতে বোধহয় দিন-চারেক বিলম্ব হইবে। বিছানা এবং প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেন চাকরকে দিয়া ঠিক করিয়া রাখা হয়।

দিন-পনেরো হইল স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে ষ্টেশন দূরে, রাত্রি আটটার মধ্যেই মোটরে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সন্ধ্যার পরে সে মকদ্দমার দরকারী কাগজ-পত্র হাণ্ডব্যাগে গুছাইয়া লইতেছিল, নির্ম্মলা আসিয়া প্রবেশ করিল।

হরিশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

নির্ম্মলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আজ কলকাতায় যাচ্চো নাকি?

হরিশ কহিল, হুঁ।

কেন?

কেন আবার কি? মক্কেলের কাজ, হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে।

চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তুমি যাবে? গিয়ে কোথায় থাকবে শুনি?

নির্ম্মলা কহিল, যেখানে হোক। তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতেও আমার লজ্জা নেই।

কথাটি ভাল, এবং সতী স্ত্রীরই উপযুক্ত। কিন্তু হরিশের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল! কহিল, তোমার লজ্জা না থাক আমার আছে। আমি গাছতলার পরিবর্ত্তে আপাততঃ কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌বো স্থির করেছি।

নির্ম্মলা বলিল, তা হ'লে ত ভালই হ'ল। তাঁর বাড়ীতেও স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আমার কোন অসুবিধা হবে না।

হরিশ কহিল, না, সে হবে না। বলা নেই কহা নেই, বিনা আহ্বানে পরের বাড়ী তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমি উঠ্‌তে পারব না।

নির্ম্মলা বলিল, পারবে না সে জানি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যর ওখানে ওঠা যায় না।

হরিশ ক্ষেপিয়া গেল। হাত-মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, তুমি যেমন নোঙ্‌রা তেমনি মন্দ। সে বিধবা ভদ্র মহিলা, আমি বা সেখানে যাবো কেন, সেই বা আমাকে যেতে বল্‌বে কেন? তা ছাড়া, আমার সময় বা কই? কলকাতায় গিয়ে পরের কাজে ত নিশ্বাস ফেলবারও ফুরসৎ পাব না।

পাবে গো পাবে, বলিয়া নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন-তিনেক পরে হরিশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী কহিল, চার-পাঁচদিন বলে গেলে, তিন দিনেই ফিরে এলে যে বড়?

হরিশ কহিল, কাজ চুকে গেল, চলে এলাম।

নির্ম্মলা জোর করিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয় নি বুঝি?

হরিশ কহিল, না।

নির্ম্মলা অতিশয় ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতাতেই যদি গেলে একবার খবর নিলে না কেন ?

হরিশ জবাব দিল, সময় পাই নি।

অত কাছাকাছি গেলে, সময় একটুখানি করে নিলেই হ'তো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার মাস-খানেক পরে একদিন আদালতে বাহির হইবার সময়ে হরিশ ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, আজ আমার ফিরতে বোধ করি একটু রাত হয়ে যাবে উমা।

কেন দাদা ?

উমা কাছেই ছিল, আস্তে বলিলেই চলিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর উঁচুতে চড়াইয়া অদৃশ্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া হরিশ উত্তর দিল, যোগীনবাবুর বাড়ীতে একটা জরুরি পরামর্শ আছে, দেরি হ'য়ে যেতে পারে।

ফিরিতে দেরিই হইল। রাত্রি বারোটার কম নয়। হরিশ মোটর হইতে নামিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইল স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল, যোগীনবাবুর বাড়ী থেকে এলে বুঝি ?

আবদুল কহিল, নেহি মাইজী, ষ্টেশনসে আতেহে।

ইষ্টিশান ? ইষ্টিশান কেন ? গাড়ীতে কেউ এলো বুঝি ?

আবদুল কহিল, কলকত্তাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া।

কলকাতা থেকে ? বাবু গিয়ে তাদের নিয়ে এসে বাসায় পৌঁছে দিলেন বুঝি ?

হাঁ, বলিয়া জবাব দিয়া আবদুল গাড়ী আস্তাবলে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হরিশ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ সম্ভাবনার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু নিজের চাকরকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিতে সে কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই। রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই লাবণ্য ছেলে লইয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাহিরের ঘরে ছিল, তাহাকে কহিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় নেই, চলুন আলাপ করিয়ে দেবেন।

হরিশের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। একবার সে এমনও বলিতে চাহিল যে, এখন অত্যন্ত কাজের তাড়া, কিন্তু সে অজুহাত খাটিল না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইল।

বছর-দশেকের ছেলে এবং লাবণ্য। নির্ম্মলা তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিল। ছেলেকে খাবার খাইতে দিল, এবং তাহার মাকে আসন পাতিয়া সযত্নে বসাইল। কহিল, আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম।

লাবণ্য ইহার উত্তর দিয়া বলিল, হরিশবাবুর মুখে শুনেছিলাম আপনি ক্রমাগত বার-ব্রত আর উপবাস ক'রে ক'রে শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলেছেন। এখনো ত বেশ ভাল দেখাচ্চে না।

নির্ম্মলা সহাস্যে কহিল, বাড়ানো কথা কিন্তু এ আবার উনি কবে বল্‌লেন? হরিশ তখনও কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কহিল, এবার কলকাতায়। খেতে বসে কেবল

আপনারই কথা। ওঁর বন্ধু কুশলবাবুর বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ী খুব কাছে কি না। ছাতের ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে শোনা যায়।

নির্ম্মলা বলিল, খুব স্থবিধে ত ?

লাবণ্য হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাতেই শুধু হয় নি, ছেলেকে পাঠিয়ে রীতিমত ধরে আন্‌তে হ'তো।

বটে ?

লাবণ্য বলিল, আবার জাতের গোঁড়ামিও কম নেই। ব্রাহ্মদের ছোঁওয়া খান না—আমার পিসিমার হাতে পর্য্যন্ত না। সমস্তই আমাকে নিজে রেঁধে নিজে পরিবেষণ করতে হ'তো। এই বলিয়া সে হাসিমুখে সকৌতুকে হরিশের প্রতি চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার কি লজিক আছে বলুন ত ? আমি কি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়া ?

হরিশের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার মনে হইল এতদিনে মা বস্থমতী দয়া করিয়া বোধ হয় তাহাকে জঠরে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, নির্ম্মলা আজ ভয়ঙ্কর উন্মাদ কাণ্ড কিছু একটা না করিয়া স্থির হইয়া রহিল। সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধ হয় তাহাকেও হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হরিশ বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ পাংশুমুখে বসিয়া রহিল। এই ভীষণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিবার কথা বহুবার তাহার মনে হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-

অবমাননাকর ও একান্ত মর্য্যাদাহীন লুকোচুরির প্রভাব যে কোনমতেই এই শিক্ষিত ও ভদ্র মহিলাটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

লাবণ্য চলিয়া গেলে নির্ম্মলা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছিঃ—তুমি এমন মিথ্যাবাদী! এত মিথ্যে কথা বল!

হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিল—বেশ করি বলি। আমার খুশী!

নির্ম্মলা ক্ষণকাল স্বামীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, বল, যত ইচ্ছে মিথ্যে বল, যত খুশী আমাকে ঠকাও। কিন্তু ধর্ম্ম যদি থাকে, যদি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি কায়মনে সতী হই—আমার জন্যে তোমাকে একদিন কাঁদতে হবে, হবে, হবে! বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

বাক্যালাপ পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ চলিতেছিল এখন সেটা দৃঢ়তর হইল এইমাত্র। নীচের ঘরে শয়ন ও ভোজন। হরিশ আদালতে যায় আসে, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া কাটায়—নূতন কিছুই নয়। আগে সন্ধ্যার সময়ে একবার করিয়া ক্লাবে গিয়া বসিত, এখন সেটুকু বন্ধ হইয়াছে। কারণ শহরের সেই দিকে লাবণ্যর বাসা। তাহার মনে হয় পতি-প্রাণা ভার্য্যার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় তাহা নিত্য। স্নানের পরে আর্শির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত সতী সাধ্বীর এই অক্ষয় প্রেমের আগুনে তাহার কলুষিত দেহের নশ্বর

মেদ-মজ্জা-মাংস শুষ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যন্ত দ্রুত উচ্চতর লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। তাহার আলমারির মধ্যে একখানা কালী সিংহের মহাভারত ছিল, সময় যখন কাটিত না তখন তাহা হইতে সে বাছিয়া বাছিয়া সতী নারীর উপাখ্যান পড়িত। কি তার প্রচণ্ড বিক্রম ও কতই না অদ্ভুত কাহিনী। স্বামী পাপী তাপী যাহাই হোক, কেবলমাত্র স্ত্রীর সতীত্বের জোরেই সমস্ত পাপ-মুক্ত হইয়া অন্তে কল্পকাল তাহারা একত্রে বাস করে। কল্পকাল যে ঠিক কত হরিশ জানিত না। কিন্তু সে যে কম নহে, এবং মুনি ঋষিদের লেখা শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত। পরলোকের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে ইহলোকের ভাবনা ভাবিত। কিন্তু কোন পথ নাই। সাহেবদের হইলে মামলা-মকদ্দমা খাড়া করিয়া এতদিনে যা হোক একটা ছাড়-রফা করিয়া ফেলিত; মুসলমানদের হইলে তিন তালাক দিয়া বহুপূর্ব্বেই চুকাইয়া ফেলিত; কিন্তু নিরীহ, এক-পত্নীব্রত ভদ্র বাঙ্গালী—না, কোন উপায় নাই। ইংরাজি শিক্ষায় বহু-বিবাহ ঘুচিয়াছে—বিশেষতঃ নির্ম্মলা চন্দ্র-সূর্য্য তাহার মুখ দেখিতে পায় না, অতি বড় শত্রুও যাহার সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক লেপন করিতে পারে না, বস্তুতঃ স্বামী ভিন্ন যাহার ধ্যান-জ্ঞান নাই, তাহাকেই পরিত্যাগ! বাপ রে! নির্ম্মল, নিষ্কলুষ-হিন্দুসমাজের মধ্যে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে? দেশের লোকে খাই খাই করিয়া হয়ত তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে।

ভাবিতে ভাবিতে চোখ কান গরম হইয়া উঠিত, বিছানা

ছাড়িয়া মাথায় মুখে জল দিয়া বাকি রাতটুকু সে চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়া দিল। এমনি করিয়া বোধ হয় মাসাধিক কাল গত হইয়া গেছে, হরিশ আদালতে বাহির হইতেছিল, ঝি আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। কহিল, জবাবের জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে।

খাম ছেঁড়া, উপরে লাবণ্যের হস্তাক্ষর। হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি আমার খুললে কে?

ঝি কহিল, মা।

হরিশ চিঠি পড়িয়া দেখিল লাবণ্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, সেদিন আমার অসুখ চোখে দেখে গিয়েও আর একটি বারও খবর নিলেন না আমি মরলুম কি বাঁচলুম। অথচ বেশ জানেন এ বিদেশে আপনি ছাড়া আমার আপনার লোকও কেউ নেই। যাই হোক্, এ যাত্রা আমি মরি নি, বেঁচে আছি। এ চিঠি কিন্তু সে-নালিশের জন্যে নয়! আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরৎ একবার এসে তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন এই ভিক্ষা। —লাবণ্য

পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়া জানাইয়াছে যে, রাত্রির খাওয়াটা আজ এইখানেই সমাধা করিতে হইবে। একটুখানি গান বাজনার আয়োজনও আছে।

চিঠি পড়িয়া বোধকরি সে ক্ষণকাল বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল ঝি হাসি লুকাইতে মুখ নীচু করিল। অর্থাৎ বাটীর দাসী-চাকরের কাছেও এ যেন একটা তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্তে তাহার শিরার

রক্ত আগুন হইয়া উঠিল—ইহার কি সীমা নাই ? যতই সহিতেছি ততই কি পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে ?

জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি কে এনেছে ?

তাঁদের বাড়ীর ঝি।

হরিশ কহিল, তাকে বলে দাও গে আমি কোর্টের ফেরৎ যাবো। বলিয়া সে বীরদর্পে মোটরে গিয়া উঠিল।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিতে হরিশের বস্তুতঃ অনেক রাত্রিই হইল। গাড়ী হইতে নামিতেই দেখিল তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া আছে!

৬

ডাক্তারের দল অল্পক্ষণ হইল বিদায় লইয়াছেন। পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, বোধহয় সমস্ত আফিঙটাই বার করে ফেলা গেছে—বৌমার জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই।

হরিশ একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া কি ভাব যে প্রকাশ করিল, বৃদ্ধ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না, কহিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন কাছে কাছে থেকে দিন-দুই সাবধানে রাখলেই বিপদটা কেটে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হরিশ স্থির হইয়া বসিয়া পড়িল।

সেদিন বার-লাইব্রেরী ঘরে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর

হইয়া উঠিল। ভক্ত বীরেন কহিল, আমার গুরুদেব স্বামীজি বলেন, বীরেন, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না। সেদিন গোঁসাইবাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তা বিশ্বাস করলে না, বললে, হরিশ এ কাজ করতেই পারে না। এখন দেখ্‌লে? গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন অনেক জিনিস জান্‌তে পারি তোমরা যা ড্রিম করো না!

ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ—হরিশটা কি স্কাউণ্ড্রেল! ও রকম সতী-সাধ্বী স্ত্রী যার, কিন্তু মজা দেখেচ সংসারে? বদমাইসগুলোর ভাগ্যেই কেবল এ রকম স্ত্রী জোটে!

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে হুঁকা লইয়া ঝিমাইতেছিলেন, কহিলেন, নিঃসন্দেহ। আমার ত মাথার চুল পেকে গেল কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। অথচ আমারই হ'ল সাত-সাতটা মেয়ে, বিয়ে দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেলাম।

যোগীনবাবু কহিলেন, আমাদের মেয়ে ইস্কুলের পরিদর্শক হিসাবে লাবণ্যপ্রভা মহিলাটি দেখেচি একেবারে আদর্শ! গভর্ণমেণ্টে বোধ করি মুভ্ করা উচিত।

ভক্ত বীরেন বলিলেন, অ্যাবসোলিউটলি নেসেসরি।

সম্পূর্ণ একটা দিন পার হইল না, সতী-সাধ্বীর স্বামী হরিশের চরিত্র জানিতে সহরে কাহারও আর বাকি রহিল না। এবং সুহৃদ্‌বর্গের কৃপায় সকল কথাই তাহার কানে আসিয়া পৌছিল।

উমা আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর।

হরিশ কহিল, পাগল!

উমা কহিল, পাগল কেন? আমাদের দেশে ত পুরুষের বহুবিবাহ ছিল।

হরিশ কহিল, তখন আমরা বর্ব্বর ছিলাম।

উমা জিদ্ করিয়া বলিল, বর্ব্বর কিসের? তোমার দুঃখ আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সমস্ত জীবনটা কি এম্‌নিই ব্যর্থ হয়েই যাবে?

হরিশ বলিল, উপায় কি বোন? স্ত্রী ত্যাগ ক'রে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের ত নেই। তোর বৌদিরও যদি এ পথ খোলা থাক্‌তো তোর কথায় রাজি হ'তাম উমা।

তুমি কি যে বল দাদা! বলিয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিশ চুপ করিয়া একাকী বসিয়া রহিল। তাহার উপায়হীন অন্ধকার চিত্ততল হইতে কেবল একটি কথাই বারম্বার উত্থিত হইতে লাগিল, পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিল।

তাহার বসিবার ঘরের মধ্যে তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল পাশের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী ভিখারীর দল কীর্ত্তনের সুরে দূতীর বিলাপ গাহিতেছে। দূতী মথুরায় আসিয়া ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। সেকালে ও অভিযোগের কিরূপ উত্তর দূতীর মিলিয়াছিল হরিশ জানিত না, কিন্তু এখানে সে ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সার উকীল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো দূতি,

নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি ত সব কথা বুঝ্‌বে না—বল্‌লেও না! কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশ বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হয় নি। কংস-টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম। একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, তবু ত তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল মথুরায় লুকিয়ে থাকা চল্‌তো! কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু শীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।

পরেশ

১

মজুমদার বংশ বড় বংশ, গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের ভারি সম্মান। বড়ভাই গুরুচরণ এই বাড়ীর কর্ত্তা, শুধু বাড়ীর কেন, সমস্ত গ্রামের কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়লোক আরও ছিল, কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র শ্রীকুঞ্জপুরে আর কেহ ছিল না। জীবনে বড় চাকুরি কখনো করেন নাই,—গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হইলে হয়ত তাহা দুষ্প্রাপ্য হইত না, কিন্তু প্রথম যৌবনে সেই যে একদিন অনতিদূরবর্ত্তী জেলা-ইস্কুলের মাষ্টারিতে ঢুকিয়াছিলেন, কোন লোভেই আর এই শিক্ষালয়ের মায়া কাটাইয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হন নাই। এখানে ত্রিশ টাকা বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়াছিল, এবং তাহার অর্দ্ধেক পঁচিশ টাকা পেন্সনে বছর-তিনেক হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আজিও হয়ত টাকাটাই একমাত্র বড় পদার্থ নয়, তা না হইলে বিবাদ মিটাইতে, সালিশ নিষ্পত্তি করিতে, দলাদলির বিচার করিয়া দিতে তাঁহার আদেশই শ্রীকুঞ্জপুরের সর্ব্বমান্য বস্তু হইয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার অপরিসীম স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতার সম্মুখে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নত

করিত। বয়স ষাটের কাছাকাছি—কেহ চরিত্র, সাধুতা বা ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি করিলে দশ-বিশ খানা গ্রামের লোক তামাসা করিয়া বলিত, ইস্! এ যে একেবারে গুরুচরণ। গুরুচরণের স্ত্রী ছিল না, ছিল একমাত্র পুত্র বিমল। জগতে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় সত্যকার কিছু নাই, না হইলে এত বড় সর্ব্বগুণান্বিত পিতার এত বড় সর্ব্বদোষাশ্রিত পুত্র যে কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিল লোকে ভাবিয়া পাইত না।

পুত্রের সহিত পিতার সাংসারিক বন্ধন ছিল না বলিলেই চলে, কিন্তু তাহার সকল বন্ধন গিয়া পড়িয়াছিল ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশের উপর। হরিচরণের বড়ছেলে পরেশই যেন তাঁহার আপনার ছেলে—পরেশ এম-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে—তাহাকে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও সমস্ত পড়া তিনি পড়াইয়া আসিতেছেন। বিমল যে কিছু শিখিল না, এ দুঃখ তাঁহার এক পরেশ হইতে মিটিয়াছে।

২

ছোটভাই হরিচরণ এত দিন বিদেশে সামান্য চাকুরিই করিতেছিল, হঠাৎ লড়ায়ের পরে কি জানি কেমন করিয়া সে বড়লোক হইয়া চাকুরি ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। লোককে চড়া সুদে টাকা ধার দিতে লাগিল, স্ত্রীর নামে একটা বাগান খরিদ করিয়া ফেলিল, এবং আরও দু-একটা কি কি কাজ করিল যাহাতে তাহার টাকার গন্ধ পাঁচ-সাত খানা গ্রামের লোকের নাকে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

একদিন হরিচরণ আসিয়া সবিনয়ে কহিল, দাদা, অনেকদিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বল্‌ব ভাবচি—

গুরুচরণ কহিল, বেশ বল।

হরিচরণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনি একলা আর কত পারবেন, বয়সও হ'ল—

গুরুচরণ কহিল, হ'ল বই কি। ষাট চল্‌চে।

হরিচরণ কহিল, তাই বলছিলাম আমি ত এখন বাড়ীতেই রইলাম, বিষয়-আশয়গুলো সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে, একটু চিহ্নিত করে নিয়ে যদি আমিই—

গুরুচরণ ক্ষণকাল ছোট ভাইয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বিষয়-আশয় আমাদের সামান্যই, আর তা এলোমেলো হয়েও নেই, কিন্তু তুমি কি পৃথক হবার প্রস্তাব কর্‌চ ?

হরিচরণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া কহিল, আজ্ঞে না না, যেমন আছে যেমন চল্‌চে তেম্‌নিই সব থাক্‌বে, শুধু যা যা আমাদের আছে একটু অমনি চিহ্ন দিয়ে নেওয়া, আর রান্না-বান্নাটাও বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার—সমস্ত একই থাক্‌বে—তবে ডালটা ভাতটা আলাদা করে নিলে বুঝ্‌লেন না—

গুরুচরণ বলিলেন, বুঝেছি বই কি। বেশ, কাল থেকে তাই হবে।

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, চিহ্নটা কি ভাবে দেবেন স্থির করেছেন।

গুরুচরণ কহিলেন, স্থির করার ত এতদিন আবশ্যক হয় নি, তবে আজ যদি হয়ে থাকে আমরা তিন ভাই তিন অংশ সমান ভাগ করে নিলেই হবে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, তিন অংশ কি রকম ? মেজবৌ বিধবা, ছেলে-পুলে নেই তাঁর আবার অংশ কি ? দুভাগ হবে।

গুরুচরণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তিন ভাগ হবে। মেজ-বৌমা আমার শ্যামাচরণের বিধবা, যত দিন বেঁচে আছেন অংশ পাবেন বই কি !

হরিচরণ রুষ্ট হইল, কহিল, আইনে পেতে পারে না, শুধু খেতে পরতে পেতে পারে !

গুরুচরণ কহিলেন, সে ত পাবেই, কেন না বাড়ীর বৌ।

হরিচরণ কহিল, ধরুন, কাল যদি বিক্রী করতে কিম্বা বাঁধা দিতে চায় ?

গুরুচরণ বলিলেন, আইনে যদি সে অধিকার দেয়, তিনি করবেন।

হরিচরণ মুখ কালো করিয়া বলিল, হুঁ করবেন বই কি।

পরদিন হরিচরণ দড়ি লইয়া ফিতা লইয়া বাড়ীময় মাপ-জোক করিয়া বেড়াইতে লাগিল, গুরুচরণ জিজ্ঞাসাও করিলেন না বাধাও দিলেন না। দিন দুই-তিন পরে ইট কাঠ বালি চূণ আসিয়া পড়িল, বাড়ীর পুরানো ঝি আসিয়া খবর দিল, কাল থেকে রাজমিস্ত্রী লাগ্‌বে, ছোটবাবুর পাঁচিল পড়বে।

গুরুচরণ সহাস্যে কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্চি গো বল্‌তে হবে কেন !

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সন্ধ্যার পরে দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া গুরুচরণ মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চুর মা, কি গা ?

পঞ্চুর মা বহুদিনের দাসী, সে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, মেজ-বৌমা দাঁড়িয়ে আছেন বড়বাবু।

বড়বৌয়ের মৃত্যুর পর হইতে বিধবা ভ্রাতৃবধূই এ সংসারের গৃহিণী, তিনি অন্তরাল হইতে ভাশুরের সহিত কথা কহিতেন; মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, শ্বশুরের ভিটেতে কি আমার কোন দাবী নেই যে ছোটবৌয়েরা আমাকে অহরহ গালমন্দ করচে?

গুরুচরণ কহিলেন, আছে বই কি বৌমা, যেমন তাঁদের আছে ঠিক তোমারও তেমনি আছে।

পঞ্চুর মা বলিল, কিন্তু এমন ধারা করলে ত বাড়ীতে আর টিক্‌তে পারা যায় না।

গুরুচরণ সমস্তই শুনিতেছিলেন, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, পরেশকে আসতে চিঠি লিখে দিয়েছি পঞ্চুর মা, একবার সে এসে পড়লেই সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে—এ কটা দিন তোমরা একটু সহ্য করে থাকো।

মেজবৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু পরেশ কি—

গুরুচরণ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু নয় মেজবৌমা, আমার পরেশের সম্বন্ধে কিন্তু চলে না। হরি তার বাপ বটে কিন্তু সে আমারই ছেলে, সমস্ত পৃথিবী যদি একদিকে যায়, তবু সে আমারই। তার জ্যাঠামশাই যে কখন অন্যায় করে না এ যদি সে না বোঝে ত বৃথাই এতদিন পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ করে এলাম।

দাসী কহিল, সে আর বলতে? সে বছর মায়ের অনুগ্রহ হলে তুমি ছাড়া আর যমের মুখ থেকে তাকে কে কেড়ে আনতে পারতো বড়বাবু? তখন কোথায় বা ছোটবাবু আর কোথায় বা তার

সংমা। ভয়ে একবার দেখ্‌তে পর্য্যন্ত এলো কাছে তখন একলা জ্যাঠামশাই, কিবা দিন কিবা রাত্রি। ইয়

মেজবৌমা বলিলেন, পরেশের নিজের মা বেঁচে থাকলেও হয়ত এতখানি করতে পারতেন না।

গুরুচরণ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, থাক্ মা ও সকল আলোচনা। তাহারা প্রস্থান করিলে বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে যেন বিমল এবং পরেশ আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইল। জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। তাহার পরে মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া সরকারের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন দুপুর-বেলায় গুরুচরণ ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন, বাটীর উত্তরদিকের বারান্দায় কতকটা অংশ ঘিরিয়া লইয়া হরিচরণের রান্নার কাজ চলিতেছিল, তথা হইতে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে কি কটু কথাই যে বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহার সীমা নাই। তাঁহার আহারের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিতেছিল, কিন্তু সহসা পুরুষের মোটা গলা আসিয়া যখন তাহাতে মিশিল, তখন ক্ষণকালের জন্যে তিনি কান খাড়া করিয়া শুনিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেজবধূ-ঠাকুরাণী অন্তরাল হইতে হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং পঞ্চুর মা ক্রোধে ক্ষোভে চীৎকার করিয়া এই দুর্ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গুরুচরণ ডাকিয়া কহিলেন, হরিচরণ, মেয়েদের কথায় আমি কান দিতে চাই নে, কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ হয়ে যদি বিধবা বড়ভাজকে এমনি করে অপমান কর, তাঁর ত তা হ'লে বাড়ীতে থাকা চলে না।

একথার [illegible] জবাব দিল না, কিন্তু বাহিরে যাইবার পথে ছোটবধূমাতার প[illegible]চিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাঁহার কানে গেল, সে তামাসা করিয়া কহিতেছে, অমন ক'রে অপমান ক'রো না বলচি, মেজ-বৌঠাকরুণ তা হ'লে বাড়ীতেই থাকবে না। কি হবে তখন?

হরিচরণ প্রত্যুত্তরে কহিতেছে, পৃথিবী রসাতলে যাবে আর কি! কেবা থাকবার জন্যে মাথার দিব্বি দিচ্চে—গেলেই ত বাঁচা যায়।

গুরুচরণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, বক্তব্য শেষ হইলে নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

৩

হেডমাষ্টার মশায়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গুরুচরণ কৃষ্ণ-নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দিন-দুই হইল পরেশ বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়াই জ্বরে পড়িয়াছে। ব্যস্ত হইয়া পাশের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে ছিলেন সম্মুখে ছোটভাইকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পরেশের নাকি জ্বর?

হুঁ, বলিয়া হরিচরণ বাহির হইয়া গেল। ছোটবধূমাতার বাপের বাড়ীর দাসী পথ আটকাইয়া বলিল, আপনি ঘরের ভেতর যাবেন না।

যাবো না? কেন?

ঘরে মা বসে আছেন।

তাঁকে একটুখানি সরে যেতে বল না ঝি।

দাসী কহিল, সরে আবার কোথায় যাবেন, ছেলের মাথায়

হাত বুলিয়ে দিচ্চেন। বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। গুরুচরণ আচ্ছন্নের মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন, পরেশ, কেমন্ আছো বাবা?

ভিতর হইতে এই ব্যাকুল প্রশ্নের কোন সাড়া আসিল না, কিন্তু ঝি কোথা হইতে জবাব দিয়া কহিল, দাদাবাবুর জ্বর হয়েছে শুনতে পেলেন ত!

গুরুচরণ স্তব্ধভাবে সেইখানে মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেখানে বিবাহ বাড়ীতে আর কেহ তেমন লক্ষ্য করিল না, কিন্তু কাজ কর্ম্ম চুকিয়া গেলে তাঁহার বহুদিনের বন্ধু হেডমাষ্টার মশাই আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি ঘটেছে গুরুচরণ। হরিচরণ নাকি ভারি তোমার পিছনে লেগেছে?

গুরুচরণ অন্যমনস্কের মত কহিলেন, হরিচরণ? কই না।

না কি হে? হরিচরণের শয়তানী কাণ্ড ত সবাই শুনেছে।

গুরুচরণের হঠাৎ কেন সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল, কহিলেন, হাঁ, হাঁ, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে হরিচরণ গণ্ডগোল কর্‌চে বটে।

তাঁহার কথার ধরণে হেডমাষ্টার ক্ষুণ্ণ হইলেন। ছেলে-বেলার অকপট বন্ধু, তথাপি গুরুচরণ ভিতরের কথা ঔদাস্যের আবরণে গোপন করিতে চাহে, ইহাই মনে করিয়া তিনি আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

গুরুচরণ কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার এই কয়েক দিনের অনুপস্থিতির অবসরে উঠানের নানাস্থানে গর্ত্ত

খুঁড়িয়া হরিচরণ এমন কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছে যে পা ফেলা যায় না। বুঝিলেন যে তাহার মর্জ্জি এবং সুবিধা মত ভদ্রাসন ভাগ হইয়া প্রাচীর পড়িবে। তাহার টাকা আছে, অতএব আর কাহারও মতামতের প্রয়োজন নাই।

নিজের ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন, মেজবৌমাকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চুর মা আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুচরণ সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ অস্ফুট আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া মেজবৌমা কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। পঞ্চুর মা নিজেও কাঁদিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই জানাইল যে, পরশু সকালে মেজবৌমাকে গলায় ধাক্কা মারিয়া হরিচরণ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, এবং সে উপস্থিত না থাকিলে মারিয়া আধমারা করিয়া দিত।

ঘটনাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গুরুচরণের অনেকক্ষণ লাগিল। তাহার পরেও তিনি মাটির মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, হরিচরণ সত্যি সত্যিই তোমার গায়ে হাত দিলে বৌমা! পারলে?

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরেশ বোধহয় শয্যাগত?

পঞ্চুর মা কহিল, তার ত কিছুই হয় নি বড়বাবু। এই ত আজ সকালের গাড়ীতে কলকাতা চলে গেল।

হয় নি? তার বাপের কীর্ত্তি সে তবে জেনে গেছে?

পঞ্চুর মা কহিল, সমস্তই।

গুরুচরণের পায়ের তলায় মাটি পর্য্যন্ত যেন দুলিতে লাগিল। কহিলেন, বৌমা, এতবড় অপরাধের শাস্তি যদি তার না হয় ত এবাড়ী থেকে বাস আমার উঠ্‌লো! এখন সময় আছে,

আমি গাড়ী ডেকে আনচি, তোমাকে আদালতে গিয়ে নালিশ করতে হবে।

আদালতে নালিশ করার নামে মেজবৌ চমকিয়া উঠিল। গুরুচরণ বলিলেন, গৃহস্থের বৌ-ঝির পক্ষে এ কাজ সম্মানের নয় সে আমি জানি, কিন্তু এতবড় অপমান যদি মুখ বুজে সহ্য কর মা, ভগবান তোমার প্রতি নারাজ হবেন। এর চেয়ে বেশি কথা আর আমি জানি নে।

মেজবৌ ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি পিতৃ-তুল্য। আমাকে যা আদেশ করবেন আমি অসঙ্কোচে পালন করব।

হরিচরণের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হইল। গুরুচরণ তাঁহার সাবেক দিনের সোনার চেন বিক্রী করিয়া বড় উকিলের মোটা ফি দাখিল করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলার ডাক পড়িল। হরিচরণ হাজির হইল কিন্তু বাদিনীর দেখা নাই। উকিল কি একটা বলিল, হাকিম মকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। ভিড়ের মধ্যে গুরুচরণের হঠাৎ চোখ পড়িল পরেশের উপর। সে তখন মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

গুরুচরণ বাটী আসিয়া শুনিলেন বাপের বাড়ীতে কাহার কি নাকি একটা ভারি অসুখের সম্বাদ পাইয়া মেজবৌ স্নানাহারের সময় পান নাই, গাড়ী ডাকাইয়া সেখানে চলিয়া গেছেন।

পঞ্চুর মা হাত-মুখ ধোবার জল আনিয়া দিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, রাতও মিথ্যে দিনও মিথ্যে বড়বাবু, তুমি আর কোথাও চলে যাও—এ পাপের সংসারে বোধ হয় তোমার আর যায়গা হবে না।

ঢাক আসিল, ঢোল আসিল, কাঁশী আসিল, মামলায় জয়ী হওয়ার উপলক্ষে ও-বাড়ীতে ৺শুভচণ্ডীর পূজার বাদ্য ভাণ্ড রবে সমস্ত গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল।

৪

দ্বিধা বিভক্ত ভদ্রাসনের এক অংশে রহিল হরিচরণ ও অপর অংশে রহিলেন গুরুচরণ ও সংসারের বহু দিনের দাসী পঞ্চুর মা। পরদিন সকালে পঞ্চুর মা আসিয়া কহিল, রান্নার সমস্ত যোগাড় করে দিয়েছি বড়বাবু।

রান্নার যোগাড়? ও—ঠিক, চল যাচ্চি। বলিয়া গুরুচরণ উঠিবার উপক্রম করিতে দাসী কহিল, কিছু তাড়াতাড়ি নেই বড়বাবু, বেলা হোক না—আপনি বরঞ্চ আজ গঙ্গা-স্নান করে আসুন।

আচ্ছা তাই যাই, বলিয়া গুরুচরণ নিমেষের মধ্যে গঙ্গা-স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কাজ বা কথার মধ্যে অসঙ্গতি কিছুই ছিল না তবুও পঞ্চুর মার কেমন যেন ভারি খারাপ ঠেকিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ যেন সে বড়বাবু নয়।

পঞ্চুর মা বাড়ীর ভিতরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, কখনো ভাল হবে না, কখনো না। শাস্তি ভগবান দেবেনই দেবেন!

কাহার ভাল হইবে না, কাহাকে তিনি শাস্তি দেবেনই দেবেন ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু ছোটর তরফ হইতে এ লইয়া বিবাদ করিতে সেদিন কেহই উদ্যত হইল না।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

গুরুচরণের একমাত্র সন্তান বিমলচন্দ্র যে সুসন্তান নহে পিতা তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। মাস-কয়েক পূর্ব্বে ঘণ্টা-কয়েকের জন্য একবার সে বাড়ী আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই। সেবার একটা ব্যাগের মধ্যে সে গোপনে কি কতকগুলা রাখিয়া যায়, চলিয়া গেলে গুরুচরণ পরেশকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, দেখ্ ত বাবা, কি আছে ওর মধ্যে। পরেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছিল, কতকগুলো কাগজ-পত্র, বোধ হয় দলিল-টলিল হবে। জ্যাঠামশাই, এগুলো পুড়িয়ে ফেলি।

গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, যদি দরকারী দলিল হয়?

পরেশ কহিয়াছিল, দরকারী ত বটেই কিন্তু বিমলদার পক্ষে বোধ হয় অদরকারী। বিপদ কাজ কি ঘরে রেখে?

গুরুচরণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, না জেনে নষ্ট করা যায় না পরেশ, কারও সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে। ওগুলো তুই কোথায় লুকিয়ে রেখে দিগে বাবা, পরে যা হয় করা যাবে।

এ ঘটনা আর তাঁর মনে ছিল না। আজ সকালে গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়া রাঁধিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই ব্যাগ হাতে পরেশ, হরিচরণ, গ্রামের জন-কয়েক ভদ্র-ব্যক্তি এবং পুলিশের দারোগা কনষ্টেবলের দল আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই যে, বিমল ডাকাতির আসামী সম্প্রতি ফেরার। খবরের কাগজে খবর পাইয়া পরেশ পুলিশের গোচর করিয়াছে। ব্যাগটা এতদিন তাহার কাছেই ছিল। বিমল মন্দ ছেলে, সে মদ খায়, আনুষঙ্গিক দোষও আছে, কলিকাতায় থাকিয়া

কি একটা সামান্য চাকুরি করিয়া সে এই সব করে। কিন্তু সে ডাকাতি করিতে পারে এ সংশয় পিতার মনের মধ্যে কখনো স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পরেশের মুখের প্রতি গুরুচরণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে সেই নিষ্প্রভ অপলক দুই চক্ষের কোণ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, বলিলেন, সমস্তই সত্যি, পরেশ একটা কথাও মিছে বলে নি।

দারোগা আরো গোটা দুই-তিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ছুটি দিল। যাবার সময় লোকটা হঠাৎ হেঁট হইয়া গুরুচরণের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, আপনি বয়সে বড়, ব্রাহ্মণ, আমার অপরাধ নেবেন না। এত বড় দুঃখের কাজ আমি আর কখনো করি নি।

আরো মাস-কয়েক পর খবর আসিল বিমলের সাত বৎসর জেল হইয়াছে।

৫

আবার ঢাক ঢোল ও কাঁশী সহযোগে ৺শুভচণ্ডীর সমারোহে পূজার আয়োজন হইতেছিল, পরেশ বাধা দিয়া কহিল, বাবা, এ সব থাক।

কেন?

পরেশ কহিল, এ আমি সইতে পারবো না।

তাহার বাবা বলিলেন, বেশ ত সইতে না পার, আজকের দিনটা কলকাতায় বেড়িয়ে এসো গে। জগন্মাতার পূজো—ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা দিয়ো না।

বলা বাহুল্য ধর্ম্মে-কর্ম্মে বাধা পড়িল না।

দিন-দশেক পরে একদিন সকালে গুরুচরণের ঘরের দিকে অকস্মাৎ একটা হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচির শব্দ উঠিল, খানিক পরে গয়লা-মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রক্ত কিসের মোক্ষদা, ব্যাপার কি?

কান্নার শব্দে বাটীর সকলে আসিয়াই পৌছিলেন। মোক্ষদা বলিল, দুধে জল দিয়েছি বলে বড়বাবু লাথি মেরে আমায় গর্ত্তে ফেলে দিয়েছেন।

হরিচরণ কহিল, কে কে? দাদা? যাঃ—

পরেশ বলিল, জ্যাঠামশাই? মিথ্যে কথা!

ছোটগিন্নী কহিলেন, বঠ্‌ঠাকুর দিয়েছেন মেয়েমানুষের গায়ে হাত? তুই কি স্বপ্ন দেখচিস্ গয়লা-মেয়ে?

সে গায়ের কাদা মাটি দেখাইয়া ঠাকুর দেবতার দিব্য করিয়া বলিল, ঘটনা সত্য। ইন্‌জংশনের কৃপায় প্রাচীর তোলা বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উঠানের গর্ত্তগুলা তেমনিই ছিল—বুজান হয় নাই। গুরুচরণ লাথি মারায় ইহারই মধ্যে মোক্ষদা পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে।

হরিচরণ কহিল, চল্ আমার সঙ্গে নালিশ করে দিবি।

গৃহিণী কহিলেন, কি যে অসম্ভব বল তুমি। বঠ্‌ঠাকুর মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবেন কি! মিছে কথা!

পরেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না।

হরিচরণ কহিল, মিছে হয় ফেঁসে যাবে। কিন্তু দাদার মুখ দিয়ে ত আর মিথ্যে বার হবে না। মেরে থাকেন শাস্তি হবে।

যুক্তি শুনিয়া গৃহিণীর সুবুদ্ধি আসিল, কহিলেন, সে ঠিক। নিয়ে গিয়ে নালিশ করেই দাও! ঠিক্ সাজা হয়ে যাবে। হইলও তাই। দাদার মুখ দিয়া মিথ্যা বাহির হইল না। আদালতের বিচারে তাঁহার দশটাকা জরিমানা হইয়া গেল।

এবার শুভচণ্ডীর পূজা হইল না বটে, কিন্তু পরদিন দেখা গেল কতকগুলা ছেলে দল পাকাইয়া গুরুচরণের পিছনে পিছনে হৈ চৈ করিয়া চলিয়াছে। গয়লানী-মারার গানও একটা ইতিমধ্যে তৈরি হইয়া গিয়াছে।

৬

রাত্রি বোধ হয় তখন আটটা হইবে, হরিচরণের বৈঠকখানা গম্ গম্ করিতেছে, গ্রামের মুরুব্বিরা আজকাল এইখানেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, অকস্মাৎ একজন আসিয়া বড় একটা মজার খবর দিল। কামারদের বাড়ীর ছেলেরা বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে দুইজন খ্যাম্‌টা আনাইয়াছে, তাহারই নাচের মজ্‌লিসে বসিয়া গুরুচরণ।

হরিচরণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, পাগল! পাগল! শোন কথা একবার। দাদা গেছে খ্যাম্‌টার নাচ দেখতে। কোন্ গুলির আড্ডা থেকে আসা হচ্চে অবিনাশ?

অবিনাশ মাইরি দিব্বি করিয়া বলিল, সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল, সঠিক সম্বাদ আনিতে। মিনিট-দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সে খবর সর্ব্বাংশেই সত্য। আর শুধু নাচ দেখাই নয়, রুমালে বাঁধিয়া প্যালা দিতেও

সে এই মাত্র নিজের চোখে দেখিয়া আসিল। একটা হৈ চৈ উঠিল। কেহ বলিল, এমন যে একদিন ঘটিবে তাহা জানা ছিল। কেহ কহিল, যেদিন বিনা দোষে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েছে সেইদিনই সব বুঝা গেছে। একজন ছেলের ডাকাতির উল্লেখ করিয়া কহিল, ঐ থেকে বাপের চরিত্রও আন্দাজ করা যায়! এমনি কত কি!

আজ কথা কহিল না শুধু হরিচরণ। সে অন্যমনস্কের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেমন যেন আজ ছেলে-বেলার কথা মনে হইতে লাগিল, একি তাহার বড়দা? একি গুরুচরণ মজুমদার?

৭

রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর, কিন্তু নাচ শেষ হইতে তখনও বিলম্ব আছে। বিশ্বকর্ম্মার পূজা সকালেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহারই জের টানিয়া ভক্তের দল মদ খাইয়া, মাংস খাইয়া খ্যাম্‌টা নাচাইয়া একটা দক্ষযজ্ঞের সমাপ্তি করিতেছে। অধিকাংশেরই কাণ্ড-জ্ঞান বোধ হয় আর নেই, আর তাহারই মাঝখানে বসিয়া স্মিতমুখে বৃদ্ধ গুরুচরণ।

কে একজন চাদরে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পিঠের উপর হাত রাখিতেই তিনি চম্‌কাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, কে?

লোকটি কহিল, আমি পরেশ! জ্যাঠামশাই, বাড়ী চলুন।

গুরুচরণ দ্বিরুক্তি করিলেন না, বলিলেন, বাড়ী? চল!

উৎসব-মঞ্চের একটা ক্ষীণ আলোক রাস্তায় আসিয় পড়িয়াছিল

সেইখানে আসিয়া পরেশ একদৃষ্টে গুরুচরণের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! চোখে সে জ্যোতিঃ নাই, মুখে সে তেজ নাই, সমস্ত মানুষটাই যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায়। এতদিন পরে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং এতদিন পরে আজ তাহার চোখে ঠেকিল লোকের কাছে জ্যাঠামশায়ের জন্য লজ্জা পাইবার আর কিছু নাই। এই অর্দ্ধ-সচেতন দেহ ছাড়িয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেছেন, কহিল, আপনার কাশী যাবার বড় ইচ্ছে জ্যাঠামশাই, যাবেন?

গুরুচরণ কাঙালের মত বলিয়া উঠিলেন, যাবো পরেশ, যাবো, কিন্তু কে আমাকে নিয়ে যাবে?

পরেশ কহিল, আমি নিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই।

তবে চল একবার বাড়ী থেকে জিনিস পত্র নিয়ে আসি গে।

পরেশ কহিল, না জ্যাঠামশাই, ও বাড়ীতে আর না। ওর কিছু আমার চাই নে!

গুরুচরণের হঠাৎ যেন হুঁস হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, কিচ্ছু চাই নে? ও বাড়ীর আমরা আর কিচ্ছুটি চাই নে?

পরেশ চোখ মুছিয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই, কিচ্ছুটি চাই নে। ও সব নেবার অনেক লোক আছে—চলুন।

চল, বলিয়া গুরুচরণ পরেশের হাত ধরিলেন। এবং জনহীন অন্ধকার পথ ধরিয়া উভয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাবলী

শেষ প্রশ্ন ...	৫৲
গৃহদাহ ...	৪॥০
শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব্ব) ...	৩৲
শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব্ব) ...	৩৲
শ্রীকান্ত (তৃতীয় পর্ব্ব) ...	৩৲
শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব্ব) ...	৩৲
পথ-নির্দ্দেশ ...	১৲
বড়দিদি ...	১॥০
পণ্ডিতমশাই ...	২৲
অরক্ষণীয়া ...	১।০
বৈকুণ্ঠের উইল ...	১॥০
মেজদিদি ...	১॥০
চন্দ্রনাথ ...	১॥০
পরিণীতা ...	১॥০
কাশীনাথ ...	২॥০
চরিত্রহীন ...	৫৲
নিষ্কৃতি ১॥০ স্বামী	১।০
দত্তা ৩৲ ছবি	১॥০
বিরাজ-বৌ ...	২৲
দেবদাস ...	২৲
বিন্দুর ছেলে ...	১৲
রামের সুমতি ...	১৲
পল্লী-সমাজ ...	২॥০
বামুনের মেয়ে ...	২৲
নারীর মূল্য ...	২৲
নব-বিধান ...	১৸০
শেষের পরিচয় ...	৪॥০
দেনা-পাওনা ...	৪৲
বিপ্রদাস ৪৲ শুভদা	২॥০
হরিলক্ষ্মী ...	১॥০
অনুরাধা, সতী ও পরেশ	১।০
শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী	৫৲

নাটক

দেবদাস ...	২৲
পথের দাবী ...	২৲
বিন্দুর ছেলে ...	১॥০
অনুপমার প্রেম ...	১॥০
রামের সুমতি ...	১॥০
বিরাজ-বৌ ...	২৲
কাশীনাথ ...	২৲
রমা ২৲ বিজয়া	২৲
ষোড়শী ২৲ নিষ্কৃতি	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা